POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড
6
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly
BADAR Qadian
Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
31
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

12 আগস্ট, 2021 ● 2 মহররম 1443 A.H

আল্লাহ্‌র বাণী

اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَالَّذِيۡنَ هَادُوۡا
وَالصّٰبِـُٔوۡنَ وَالنَّصٰرٰى مَنۡ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوۡفٌ
عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ○(المائدہ:70)

নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে তাহারা এবং সাবীগণ এবং খৃষ্টানগণ- যে কেহ ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর এবং সৎকর্ম করে, না তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না তাহারা দুঃখিত হইবে।

(আল মায়েদা: ৭০)

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

যথাস্থানে সম্পদ খরচ করার এবং অপরকে শেখানোর শ্রেষ্ঠত্ব।

১৪০৯) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, 'আমি নবী (সা.) কে একথা বলতে শুনেছি: ঈর্ষা করা উচিত নয়, কিন্তু কেবল দুই (ব্যক্তি)-এর উপর ভিন্ন। এক, সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা সম্পদ দান করেছেন আর তাকে সেই সম্পদ যথাস্থানে খরচ করার তৌফিক দান করেছেন। দ্বিতীয়, সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'লা সঠিক জ্ঞান দান করেছেন আর সে নিজেও সেই জ্ঞান বাস্তবায়িত করে আর লোককেও শেখায়।

পবিত্র সম্পদ থেকে সদকা দান করো।

১৪১০) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে -ব্যক্তি পবিত্র (সৎ) উপার্জন থেকে খেজুর তুল্যও সদকা করে, আর আল্লাহ্ পবিত্র বস্তুকেই গ্রহণ করেন, আল্লাহ্ সেই সদকাকে ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সদকা প্রদানকারীর জন্য তা বৃদ্ধি করেন। ঠিক সেই ভাবে যেভাবে তোমাদের মধ্যে কেউ নিজের বাছুর পোষে। আর ক্রমেই তা (সদকা) পর্বত সমান হয়ে যায়।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৯ই জুলাই ,২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত জার্মানী, ২০১৪ (জুন)

খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট ও আওয়লিয়াদের বিরোধিতা এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার পরিণাম কখনও ভাল হতে পারে না। যে ব্যক্তি মনে করে যে সে তার উপর অত্যাচার করে, তাকে কষ্ট দেওয়ার পরও সুখ লাভ করতে পারে, সে চরম বিভ্রান্তিতে আছে, সে আত্ম প্রবঞ্চনার শিকার।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

পুণ্যকর্ম চেনার উপায়

যখন কেউ কাউকে ভালবাসে, যেভাবে কেউ নিজ সন্তানকে ভালবাসে, আর অপর এক ব্যক্তি যদি বার বার একথা বলে যে, 'এই ছেলেটি মরে যাক' বা তার সম্পর্কে অন্য কোন মর্মপীড়াদায়ক কথা বলে, তাকে কষ্ট দেয়, তবে সেই ব্যক্তিকে কেউ-ই পছন্দ করবেনা, এটিই তো নিয়ম। একজন পিতা কিভাবে এমন ব্যক্তিকে ভালবাসতে পারে, যে কিনা তার সন্তানকে অভিশাপ দেয় বা তার জন্য পীড়াদায়ক বলে? অনুরূপভাবে আওলিয়ারাও আল্লাহ্‌র সন্তানের ন্যায়, কেননা তারা দৈহিক সাবালকত্বের আবরণ ছেড়ে বেরিয়ে এসে আল্লাহ্‌র সমীপে পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছে তাঁর কৃপা-ক্রোড়ে বিকশিত হতে। তিনি তাদের অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক এবং তাদের জন্য আত্মাভিমান পোষণকারী। যখন কোন ব্যক্তি- সে যে ভাবেই নামায পড়ুক বা রোযা রাখুক- তাদের বিরোধিতা করে এবং কষ্ট দেওয়ার জন্য কোমর বেঁধে লাগে, তখন আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান জেগে উঠে এবং বিরোধিতাকারীদের উপর তাঁর ক্রোধ নেমে আসে। কেননা, তারা তাঁর এক প্রিয়ভাজনকে কষ্ট দিতে চেয়েছে। সেই সময় নামায রোযা কিছুই কাজে আসে না। কেননা নামায ও রোযার মাধ্যমে সেই সত্তাকেই তো প্রীত করার বাসনা ছিল যাঁকে তার অন্য একটি কাজ অসন্তুষ্ট করে তুলেছে। তাই সেই সন্তুষ্টির মর্যাদা কিভাবে লাভ হওয়া সম্ভব, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐশী ক্রোধ দূর না হয়? আর নির্বোধরা এই ক্রোধের কারণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। তারা তো নিজেদের নামায রোযা নিয়ে এক প্রকার গর্বিত থাকে। পরিণামে খোদা তা'লার ক্রোধ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, আর তারা খোদার নৈকট্য লাভের পরিবর্তে তাঁর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। অবশেষে এমন ব্যক্তিরা উর্ধ্বলোকে সম্পূর্ণরূপে অভিশপ্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি একেবারে আত্মবিলীনতার অবস্থায় রয়েছে এবং খোদার দরবারে নিজেকে সঁপে দিয়েছে এবং প্রতিপালকের আশ্রয়ে লালিত হচ্ছে এবং খোদার কৃপা তাকে পরিবেষ্টন করে আছে, এমনকি তার কথা বলা যেন খোদার কথা বলা, তার বন্ধু খোদার বন্ধু এবং তার শত্রু খোদার শত্রু- কাজেই খোদার শত্রু হয়েও কি কোন ব্যক্তি পূর্ণ মোমেন হতে পারে? এভাবে তার ঈমান হানি হয় এবং সে খোদার অভিশপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়। খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট ও আওয়লিয়াদের বিরোধিতা এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার পরিণাম কখনও ভাল হতে পারে না। যে ব্যক্তি মনে করে, সে তার উপর অত্যাচার করে, তাকে কষ্ট দেওয়ার পরও সুখ লাভ করতে পারে, সে চরম বিভ্রান্তিতে আছে, সে আত্ম প্রবঞ্চনার শিকার।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৪)

খোদার কৃপায় নবীরা নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তবে নবী যে বলছেন 'আমাকে ক্ষমা কর'- এর অর্থ কি? মোমেনের বিভিন্ন পদমর্যাদা অনুসারে 'ইগফিরলি-' এর বিভিন্ন অর্থ।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইব্রাহিমের ৪২ নং আয়াত رَبَّنَا اغۡفِرۡ لِيۡ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِيۡنَ يَوۡمَ يَقُوۡمُ الۡحِسَابُ এর ব্যাখ্যায় বলেন-

খোদার কৃপায় নবীরা নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তবে নবী যে বলছেন 'আমাকে ক্ষমা কর'- এর অর্থ কি? আসলে সেই সব ব্যক্তির দৃষ্টি অত্যন্ত সীমিত, যারা খোদা তা'লার পরিচয় লাভ থেকে বঞ্চিত। এমন ব্যক্তির দৃষ্টি মানুষ পর্যন্ত যায়, মানুষকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু খোদার পরিচয় লাভকারী ব্যক্তির দৃষ্টি উর্ধ্বলোক পর্যন্ত বিস্তৃত। সে উপলব্ধি করে নেয় যে আল্লাহ্‌র সামনে বান্দার কোন অস্তিত্বই নেই। সূর্যের সামনে একটি ধূলিকণার কি মূল্য আছে? কেননা মানুষ তো তাঁরই সৃষ্টি। তার জীবনও খোদার তা'লার দান। আর হিদায়তও তাঁর পক্ষ থেকে আসে। গালিব কি চমৎকার কথা বলেছেন-

'জান দি , দি হুই উসি কি থি,
হক তো ইয়ে হ্যায় কি হক আদা না হুয়া।'

এরপর ৮ এর পাতায়......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৪ (জুন) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

১৬ জুন, ২০১৪

লিথোনিয়ার অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

একজন ছাত্রী নিজের আবেগ অনুভূতির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, জলসার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আমাকে ভীষণ প্রভাবিত করেছে। আপনাদের মধ্যে থেকে ইসলামের প্রকৃত রূপ দেখার সুযোগ পেয়েছি। সকলে খুব ভালবাসা দিয়ে নিজেদের এবং জামাতের পরিচয় তুলে ধরছিল। এত লোক, কিন্তু কি অসাধারণ ব্যবস্থাপনা! কোথাও কোনও প্রকার অব্যবস্থা চোখে পড়ে নি। এখানকার মানুষ অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ।আমি এই প্রথম যুগ খলীফাকে নামায পড়াতে শুনলাম। তাঁর কন্ঠে এক বেদনা ও প্রভাব ছিল। সবাই তাঁর প্রতি অনুগত। যেমন নারাধ্বনি দেওয়ার সময় হুযুর আনোয়ার নীরব হতে বললে সকলে তৎক্ষণাৎ নীরব হয়ে বসে পড়ল। খলীফার ব্যক্তিত্বই এমন যে, তাঁকে দেখেই আধ্যাত্মিক ভাবের উদয় হয়।

আরও এক ছাত্রী বলেন, ধর্মের বিষয়ে আমার দারুন আগ্রহ। বর্তমান যুগে মানুষ একে অপরের জন্য কিরূপ মনোভাব পোষণ করে তা আমার কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে বুঝলাম যে, সত্যিই তিনি একজন আধ্যাত্মিক নেতা।তাঁর মধ্যে এমন কিছু আছে যা দেখলেই তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধায় হৃদয় আপ্লুত হয়। তাঁর চোখে প্রশান্তি রয়েছে, তিনি ভীষণ সরল স্বভাবের আর একটি জামাতের নেতার এই বৈশিষ্ট্যই থাকা কাম্য।

এস্টোনিয়া থেকে আগত এক দম্পতি বলেন- আমরা এমন এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি যার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান অতুলনীয় ছিল। আমি জীবনে এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য দেখি নি যেখানে হাজার হাজার মানুষ একত্রে বসে খোদাকে স্মরণ করছে। (তিনি নারায়ে তকবীর- আল্লাহু আকবর সম্পর্কে বলছিলেন)।

এত ব্যাপক আকারে এমন উৎকৃষ্ট মানের আয়োজন করা আপনাদের বিশেষত্ব যা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আপনাদের খলীফা জামাতের মহিলাদের শিক্ষার বিষয়েও সচেতন আছেন আর তিনি অসাধারণ কীর্তি অর্জনকারী মেয়েদের মধ্যে পুরস্কারও বিতরণ করেন। এই বিষয়টি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে।

এস্টোনিয়া থেকে আসা অতিথির একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- জলসার একটি মহৎ উদ্দেশ্য হল জামাতের সদস্যদের আধ্যাত্মিকতার মান সমুন্নত করা। এই জিনিসটি অর্জিত হলে জলসা সফল। আর যদি এর অভাব হয় তবে পরের বছর তা দৃষ্টিপটে রাখা হয় আর সেই দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করা হয়।

রোমানিয়া থেকে আগত অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত

রোমানিয়া থেকে তিনজন অতিথি এসেছিলেন। যাদের মধ্যে ছিলেন হোসেন আলহাফিয সাহেব, যিনি সিরিয়ার মূল নিবাসী। কিন্তু দীর্ঘকাল রোমানিয়ায় বাস করছেন। জলসায় অংশগ্রহণ করার পর মুবাল্লিগ সাহেবকে বলেন,' খলীফা সাহেবকে আমরা দূর থেকেই দেখব না কি কাছে গিয়েও দেখার সুযোগ পাব?' মুবাল্লিগ সাহেব তাদেরকে বলেন হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত হবে। সেই ব্যক্তি জানায়, সে একথা বিশ্বাস করতে পারছিল না যে খলীফা তাদের মত সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যও সময় দিতে পারবেন। একথা তিনি হুযুরের সামনেও বলেন। সাক্ষাত হওয়ার পর তারা কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। এবং যাজাকুমুল্লাহ্ বলেন। সাক্ষাতের জন্য যাওয়ার পূর্বে তিনি আসতাগফিরুল্লাহও পাঠ করছিলেন। আর মুবাল্লিগ সাহেবকে বিশেষ করে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি আনন্দে আবেগাপ্লুতহয়ে পড়েন, সেক্ষেত্রে তিনি হুযুরের হাত চুম্বন করতে পারেন? চুম্বন করতে পারবেন জেনে তিনি ভীষণ খুশি হন, আর সাক্ষাতের সময় তিনি হুযুরের হাতে তিনবার চুম্বন করেন।৷ জলসার প্রথম দিন থেকেই তিনি বলতে শুরু করেন যে, তিনি খলীফাকে ভালবাসেন। আর বার বার একথা বলতে থাকেন যে, সারা বিশ্বে যদি ইসলামের একজন খলীফাতুল মুসলেমীন থাকে, তবে মুসলমানদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে। কেননা খলীফাই আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে পারে। সাক্ষাতের সময়ও তিনি একথা অকপটে স্বীকার করে বলেন, আজ সিরিয়াবাসীদের কাছে যদি খলীফা থাকত তবে এমন পরিস্থিতি হত না।

তিনি এও বলেন যে এই সাক্ষাতটি আমার জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

তিনি মুবাল্লিগ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে খলীফার নির্বাচন কিভাবে হয়। মুবাল্লিগ সাহেব তাঁকে খিলাফত নির্বাচন সম্পর্কে জানান। এবং এও বলেন যে খিলাফতে রাশেদাও নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা নির্বাচনের মাধ্যমে মোমেনদেরকে মনোনীত বান্দাদের জন্য নিজ অলৌকিক শক্তি ও গোপন ওহী দ্বারা একত্রিত করে দেন। গোপন ওহী এবং ঐশী প্রক্রিয়ার বিষয়টি তিনি বুঝতে পারেন নি। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত এই বিষয়তি তাঁর কাছে পরিস্কার হয়ে যায়। তিনি নিজেই বলেন যে, হুযুর আনোয়ার লাজনাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে যখন যোহর ও আসরের নামাযের জন্য আসছিলেন আর লোকেরা তাঁকে দেখার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন তিনিও হুযুরকে দেখার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে যান। হুযুর আনোয়ার যখন তাঁর কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন আর তাঁর চোখ হুযুরের উপর পড়ল, তখন অবলীলায় তাঁর হাত হুযুরকে সালাম করার জন্য উপরে উঠে গেল। তিনি বলেন, এই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত এই কাজটির মাধ্যমে তিনি অলৌকিক ক্রিয়া এবং গোপন ওহীর রহস্য ভেদ হয়েছে। তিনি এও বলেন যে, সাধারণত হাত তুলে বা হাত নেড়ে কাউকে সালাম করার অভ্যেস আমার নেই, ওবামা হলেও না। কিন্তু হুযুরকে দেখে আমার মধ্যে যা ঘটল তা অলৌকিক ক্রিয়া বা গোপন ওহীর দ্বারাই সংঘটিত হতে পারে। এমনটি করা আমার নিয়ন্ত্রনের বাইরে ছিল।

তিনি বলেন, আমি অনেকাংশেই আহমদীয়াতের অনুরাগী হয়ে পড়েছি। এখন পুরোপুরিভাবে আশ্বস্ত হওয়ার পর আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই।

আরব অতিথিদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয় যে কি উপায়ে মুসলমান দেশসমূহকে ঐক্যবন্ধ করা যায়? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন-

মুসলিম জাতি নিজেদের কতর্ব্য ও দায়িত্বাবলী ভুলে গেছে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মেনে চলার পরিবর্তে সেই শিক্ষা তারা ভুলে বসেছে, নানাবিধ বিদাত তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে। খোদা তা'লা ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকিম দোয়া শেখানোর মাধ্যমে সঠিক রাস্তা সন্ধানের দোয়া শিখিয়েছেন।

আলহামদোলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন -এর মাধ্যমে আল্লাহ্ ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি সমগ্র জগতের প্রভু প্রতিপালক, তিনি অযাচিত দাতা ও পরম দয়াময়। তোমরা যদি নিজেরা মানুষের প্রতি দয়া কর, তবে খোদা তা'লা তোমাদের উপর দয়া করবেন। নিজেদের লোককে যদি নির্মমভাবে হত্যা কর, তবে কিভাবে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে শান্তি ও দয়ার আশা করতে পার?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি নিজ গণ্ডির মধ্যে প্রশাসনিক কর্তাদের বোঝান, তারা যেন ইসলামের সঠিক শিক্ষা বোঝে। এই শিক্ষা শিরোধার্য করলে তবেই মুক্তি পাওয়া যাবে।

ভদ্রলোক বলেন: আমাদের কাছে খলীফা নেই, সেই কারণে মুসলমানদের অবস্থার অবনতি হচ্ছে, চতুর্দিকে অরাজকতা বিরাজ করছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, আহমদীয়া খিলাফতের মান্যকারী কেবল পাকিস্তানেই নয়, আফ্রিকার এক বিরাট জনগোষ্ঠী আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে, তারা আহমদীয়াতের খিলাফতের জন্য নিবেদিত প্রাণ, তারা পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ আচরণ করে। পৃথিবীর ২০৪টি দেশে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অনুসারীরা ছড়িয়ে আছে।

দলের সদস্যরা বলেন, আমরা খলীফাতুল মসীহকে রোমানিয়ায় দেখতে চাই। হুযুর বলেন, খোদা করুন এই কথাটি কোন সময় সত্য হোক আর আমি সেখানে যাই।

তিনি বলেন, জলসায় আসার পূর্বে নিশ্চয় আপনাদের মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা ছিল যা এখানে আসার পর দূর হয়েছে। আপনারা 'ইসলামী ওসুল কি ফিলাসফী' পড়ুন এবং আমার রচনা 'পাথ ওয়ে টু পিস' পড়ুন। রেডিও ও টিভিতে ইসলামের বিষয় আপনারা শোনেন, আর যদি বই পুস্তক পড়েন তা হলে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন। আর জানতে পারবেন যে আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমল করি আর মোল্লারা ভ্রান্ত শিক্ষার উপর চলছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই সম্পর্কে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে ইসলামের উপর এমন এক যুগ আসতে চলেছে যখন ইসলামের ধ্বজাধারীরা এর শিক্ষাকে ভুলে যাবে, তারা কেবল নামমাত্র মুসলমান হবে। মসজিদগুলি তাদের বাহ্যত নামাযি দ্বারা পরিপূর্ণ হলেও হিদায়তশূন্য হবে। কুরআনের শব্দাবলীল ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের উলেমারা আকাশের নীচে বসবাসকারী নিকৃষ্টতম জীব হবে। অর্থাৎ যাবতীয় মন্দের উৎস তারাই হবে। সেই সময় একজন সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটবে, যিনি সকলকে একত্রিত করবেন, সকল ধর্মের মানুষকে সংঘবন্ধ করবেন আর ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রসার করবেন এবং সকলকে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবন্ধ করবেন। সুতরাং, আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটেছে, তিনি মসীহ ও মাহদী হয়ে এসেছেন। ১৮৮৯ সালে জামাতে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা আগমণকারী মসীহকে মান্য করেছি, আর অন্যান্য মুসলমানেরা তাঁকে মান্য করে নি। আহমদী ও অ-আহমদীদের মধ্যে এটিই মূল পার্থক্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামি শিক্ষার দৃষ্টান্ত আপনারা এখানে

(এরপর ৯ পাতায়..)

জুমআর খুতবা

হযরত উমর (রা.) আদালতে সাম্য ও ন্যায়কে দৃষ্টিপটে রাখার উপদেশ দিয়েছেন।

হযরত উমর (রা.) 'ইফতা বিভাগ'ও চালু করেন। শরীয়তের বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত করার জন্য 'ইফতা বিভাগ' চালু করেন এবং কয়েকজন সাহাবীর নাম ঘোষণা করেন যে, তারা ছাড়া অন্য কারো ফতোয়া গ্রহণ করা হবে না।

হযরত উমর দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে 'আহদাস' বা পুলিস বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন।

যে اَلْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ অর্থাৎ শক্তিশালী ও বিশ্বস্তকে দেখতে চায় সে এই ব্যক্তিকে দেখুক।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য। "

হে লোকসকল! উমর এবং তার বংশের জন্য, তারা দুরের হোক বা নিকটের, ততটুকুই অধিকার আছে যতটা সাধারণ মুসলমানদের আছে, এর অধিক নেই।

"হযরত উমর (রা.) প্রবর্তিত চল্লিশটি ব্যবস্থাপনার উল্লেখ।

এবং অতিরিক্ত সম্পদ বায়তুল মালে জমা করা হত।

চারজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করা হয় ও জানাযা গায়েব পড়ানো হয়, তারা হলেন- মাননীয় সারপিতো হাদী (ইন্ডোনেশিয়া) চৌধরী বশীর আহমদ ভট্টী, (নানাকানা সাহেব জেলা), মাননীয় হামীদুল্লাহ্ খদিম মুলহি সাহেব (রাবোয়া), মাননীয় মহম্মদ আলি খান সাহেব পেশোয়ার, মাননীয় সাহেবযাদা মাহদী লতিফ সাহেব, মেরিল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র), ফয়জান আহমদ সমীর ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ৯ জুলাই, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (৯ ওয়াফা, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত উমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল। 'কাযা বিভাগ' (তথা বিচার বিভাগ) প্রতিষ্ঠার বিষয়ে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) 'কাযা বিভাগ' খুলেছিলেন। সকল জেলায় নিয়মিত আদালত প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাজী পদায়ন করেন। হযরত উমর (রা.) কাযাবা বিচারবিভাগ সম্পর্কে আইন সংক্রান্ত নির্দেশাবলী জারী করেন।(আল ফারুক, প্রণেতা শিবলী নুমানী, পৃ: ৯৫-৯৮)

কাজী নিয়োগের ক্ষেত্রে ফিকাহ্ বিশেষজ্ঞদের মনোনয়ন দেওয়া হতো, কিন্তু -হযরত উমর (রা.) এটিকেই যথেষ্ট মনে করতেন না, বরং রীতিমতো তাদের পরীক্ষা নিতেন। কাজীদের জন্য চড়া বেতন নির্ধারণ করতেন যেন কেউ অন্যায় সিদ্ধান্ত প্রদান না করে। সম্পদশালী এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের কাজী মনোনয়ন দিতেন যেন সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা অন্য কারো প্রভাবে প্রভাবিত না হন। হযরত উমর (রা.) আদালতে সাম্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিতেন। একবার হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-এর সাথে [হযরত উমর (রা.)-এর] কোন বিষয়ে বিবাদ দেখা দেয়। হযরত উবাই (রা.) হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)-এর আদালতে মামলা করেন। হযরত যায়েদ (রা.) হযরত উমর (রা.) এবং উবাই (রা.)-কে উপস্থিত হতে বলেন আর (উপস্থিতির পর কাজী) হযরত উমর (রা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, (হে যায়েদ!) এটি তোমার প্রথম অন্যায়- একথা বলে তিনি উবাই (রা.)-এর পাশ গিয়ে বসেন। (আল ফারুক, প্রণেতা শিবলী নুমানী, পৃ: ১৯৯-২০০)

অর্থাৎ আমরা দুটি বিবদমান পক্ষ এবং উভয় বিবদমান পক্ষকে সাম্যের চোখে দেখ আর পাশাপাশি বসাও, আমাকে এক্ষেত্রে অধিক সম্মান দিও না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ ঘটনার উল্লেখ এভাবে করেছেন যে, একদা দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর সাথে উবাই বিন কা'ব (রা.)-এর [কোন বিষয়ে] দ্বন্দ্ব হয়। কাজীর কাছে মামলা দায়ের করা হয়। তিনি হযরত উমর (রা.)-কে আদালতে উপস্থিত হতে বলেন এবং তিনি (রা.) উপস্থিত হলে সম্মানার্থে তাঁর (রা.) জন্য নিজের চেয়ার ছেড়ে দেন একথা ভেবে যে, তিনি তো যুগ-খলীফা। কিন্তু হযরত উমর (রা.) প্রতিপক্ষের পাশে গিয়ে বসেন এবং কাজীকে সম্বোধন করে বলেন, এটি তোমার প্রথম অবিচার, যা তুমি করলে। এ মুহূর্তে আমার ও আমার প্রতিপক্ষের মাঝে কোন পার্থক্য করা সমীচীন নয়।

(আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকী ইসলা, আনোয়ারুল উলুম, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩০০)

হযরত উমর (রা.) 'ইফতা বিভাগ'ও চালু করেন। শরীয়তের বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত করার জন্য 'ইফতা বিভাগ' চালু করেন এবং কয়েকজন সাহাবীর নাম ঘোষণা করেন যে, তারা ছাড়া অন্য কারো ফতোয়া গ্রহণ করা হবে না। এই ফতোয়াদাতাদের মাঝে ছিলেন যথাক্রমে হযরত আলী (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.), হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.), হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এবং হযরত আবু দারদা (রা.) প্রমুখ। তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ ফতোয়া দিলে হযরত উমর (রা.) তাকে বারণ করতেন। হযরত উমর (রা.) এই মুফতিদেরও বিভিন্ন সময় পরীক্ষা নিতেন। (আল ফারুক, প্রণেতা শিবলী নুমানী, পৃ: ২০২)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ বিষয়ে বলেন যে, ফতোয়া বিষয়ক একটি ঘটনা রয়েছে। মহানবী (সা.)-এর (তিরোধানের) পর খলীফাদের যুগে শরীয়তের বিষয়ে সবার ফতোয়া দেওয়ার অধিকার ছিল না। হযরত উমর (রা.) এ বিষয়ে এতটাই সাবধানতা অবলম্বন করতেন যে, এক সাহাবী, সম্ভবত হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'উদ (রা.), যিনি ধর্মীয় জ্ঞানে বেশ পারদর্শী ছিলেন এবং অনেক সম্মানিত মানুষ ছিলেন, একবার তিনি (রা.) (ফতোয়া স্বরূপ) কোন মাসলা মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন। হযরত উমর (রা.) এ বিষয়ে জানতে পেরে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে জবাবদিহি করেন যে, তুমি কি আমীর নাকি তোমাকে আমীর ফতোয়া দেওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন? মোটকথা যদি প্রত্যেক ব্যক্তি ফতোয়া দেওয়ার অধিকার লাভ করে তাহলে বহু সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এবং জনসাধারণের জন্য কতক ফতোয়া পরীক্ষার কারণ হতে পরে, কেননা কখনো কখনো একই বিষয়ের জন্য দু'টো ভিন্ন ভিন্ন ফতোয়া হয়ে থাকে এবং দু'টোই সঠিক হয়ে থাকে। অর্থাৎ ফতোয়া পরিবেশ-পরিস্থিতি সাপেক্ষে দেওয়া হয়ে থাকে; বিষয়াবলী যদি গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তবে তাতে ছাড়ের সুযোগ থাকে যে, অবস্থা এমন হলে ফতোয়া এটি হবে, অবস্থা যদি ভিন্ন হয় তবে ফতোয়াও ভিন্ন হবে। কিন্তু জনসাধারণের জন্য এটা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে যে, দু'টোই কীভাবে সঠিক হতে পারে? ফলে তারা পরীক্ষায় নিপতিত

হয়। (আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪০৪)

একইভাবে পুলিশ বিভাগও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত উমর দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য 'আ'দাস' অর্থাৎ পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিভাগকে তিনি জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, বাজারের তত্ত্বাবধান প্রভৃতির কর্তৃত্ব প্রদান করেছিলেন; অর্থাৎ জনগণের ওপর এই দৃষ্টি রাখা যে, সঠিকভাবে আইন মান্য করা হচ্ছে কি-না, যদি কারো অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয় তবে তাদের অধিকার পাইয়ে দেওয়া, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো কাজীর কাছে উত্থাপিত হওয়া পর্যন্ত তারা দেখাশুনা করতেন। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, বাজারের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি বিষয়ের তত্ত্বাবধানের কর্তৃত্ব তাদের ছিল। হযরত উমর যথারীতি কারাগারও নির্মাণ করান, ইতিপূর্বে কারাগারের প্রচলন ছিল না; অপরাধীদের কঠোর শাস্তিও দেওয়া হতো।

অনুরূপভাবে বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও রয়েছে। হযরত উমরের যুগের পূর্বে যে সম্পদই আসতো তা সাথে সাথে বিতরণ করে দেওয়া হতো। হযরত আবু বকরের যুগে একটি বাড়ি কিনে বায়তুল মাল হিসেবে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছিল, কিন্তু তা বন্ধই থাকতো। কারণ যে সম্পদই আসতো তা সাথে সাথেই বিতরণ করে দেওয়া হতো। ১৫ (পঞ্চদশ) হিজরী সনে বাহরাইন থেকে পাঁচ লক্ষ পরিমাণ অর্থ এলে হযরত উমর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন যে, এই অর্থ দিয়ে কী করা যায়। একটি অভিমত এরূপ ছিল যে, সিরিয়ান সাম্রাজ্যে কোষাগার বিভাগ রয়েছে; সুতরাং এই পরামর্শ হযরত উমর পছন্দ করেন এবং মদিনায় বায়তুল মালের ভিত্তি রাখেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আরকামকে কোষাগারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে মদিনা ছাড়াও সকল প্রদেশ ও সেগুলোর রাজধানীতে বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। হযরত উমর স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে (সাধারণত) কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করতেন, কিন্তু বায়তুল মালের জন্য অত্যন্ত মজবুত ও সুরম্য ভবন নির্মাণ করাতেন। পরবর্তীতে সেগুলোর জন্য প্রহরীও নিয়োগ করা হয়েছিল। (আল ফারুক, প্রণেতা শিবলী নুমানী, পৃ: ২০৩-২০৫)

সেগুলোর পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বায়তুল মালের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ স্বয়ং হযরত উমর করতেন। ইতিহাসে একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত উসমান বিন আফফানের একজন মুক্ত কৃতদাস বর্ণনা করেন, একদিন প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। আমি হযরত উসমানের সাথে 'আলিয়া' নামক স্থানে তার গবাদি পশুর কাছে ছিলাম। [আলিয়া হলো মদিনা থেকে নাজ্‌দ-এর দিকে চার থেকে আট মাইল দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত উপত্যকার নাম।] তিনি এক ব্যক্তিকে দেখতে পান যে দুটি (কমবয়স্ক) হৃষ্টপুষ্ট উটকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। [অর্থাৎ হযরত উসমান দেখতে পান, এক ব্যক্তি আসছে এবং দুটি হৃষ্টপুষ্ট উট তার সামনে সামনে চলছে।] আর মাটি ছিল খুবই উত্তপ্ত। এটি দেখে হযরত উসমান বলেন, এই লোকটার কী হয়েছে? যদি সে মদিনায় অবস্থান করত এবং আবহাওয়া ঠাণ্ডা হওয়ার পর বের হতো, তবে তার জন্য ভালো হতো! [সেই কর্মচারী বলেন,] যখন সেই ব্যক্তি কাছে আসে তখন হযরত উসমান আমাকে বলেন, দেখ তো লোকটি কে! আমি বললাম, চাদর-মুড়ি দেওয়া এক ব্যক্তি যে দুটি হৃষ্টপুষ্ট উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এরপর সেই ব্যক্তি যখন আরও কাছে আসে তখন হযরত উসমান পুনরায় বলেন, দেখ তো কে! আমি গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি হযরত উমর বিন খাত্তাব। আমি নিবেদন করলাম, ইনি তো আমীরুল মুমিনীন! হযরত উসমান উঠে দরজা দিয়ে মাথা বাইরে বের করেন, কিন্তু তীব্র গরম বাতাসের ঝাপটা লাগায় তিনি মাথা ভেতরে ফিরিয়ে আনেন এবং সাথে সাথেই পুনরায় (মাথা বের করে) হযরত উমরকে লক্ষ্য করে বলেন, কীসে আপনাকে এখন ঘর থেকে বের হতে বাধ্য করল?' হযরত উমর বলেন, সদকার উটগুলোর মধ্য থেকে এই দু'টো উট পেছনে রয়ে গিয়েছিল, এই দু'টো ছাড়া অবশিষ্ট সব উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমার মনে হলো, এই দু'টোকে চারণভূমিতে নিয়ে যাওয়া উচিত। আমার শঙ্কা ছিল যে, এই দু'টো হারিয়ে যেতে পারে, পরে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সেগুলোর বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন। হযরত উসমান বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ছায়ায় আসুন এবং পানি পান করুন, আমরাই আপনার জন্য যথেষ্ট। আমরা সেবা করব, পাঠানোর ব্যবস্থা করব। হযরত উমর বলেন, তোমার ছায়ায় তুমি ফিরে যাও আর সেখানে বসে থাক। হযরত উমরের মুক্ত কৃতদাস বলেন, আমি নিবেদন করলাম আমাদের কাছে যা আছে তা আপনার জন্য যথেষ্ট। উত্তরে হযরত উমর বলেন, তোমার ছায়ার দিকে ফিরে যাও। এরপর হযরত উমর চলে যান। হযরত উসমান বলেন, যে الْقَوِيُّ الْأَمِينُ অর্থাৎ শক্তিশালী ও বিশ্বস্তকে দেখতে চায় সে এই ব্যক্তিকে দেখুক।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, উমর বিন না'ফে আবু বকর ঈসার নিকট থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব, হযরত উসমান বিন আফফান এবং হযরত আলী বিন আবু তালেবের সাথে সদকার সময় আসি। হযরত উসমান ছায়ায় বসে যান এবং হযরত আলী তারপাশে দাঁড়িয়ে ঐসব কথা তাকে বলেন যা হযরত উমর বলতেন। হযরত উমর তীব্র গরমের দিন হওয়া সত্ত্বেও রোদে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর কাছে দুটি কালো চাদর ছিল। একটি তিনি লুঙ্গিরূপে পরেছিলেন আরেকটি মাথায় রেখেছিলেন এবং সদকার উট পর্যবেক্ষণ করছিলেন ও উটের রং ও বয়স লিখে নিচ্ছিলেন। হযরত আলী হযরত উসমানকে বলেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে তুমি হযরত শুয়ায়েবের কন্যার এ বাক্য শুনেছ যে, إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (আল কাসাস: ২৭) অর্থাৎ, নিশ্চয় যাদেরকেই তুমি চাকর নিযুক্ত করবে তাদের মধ্যে সে-ই উত্তম প্রমাণিত হবে যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। অতঃপর হযরত আলী হযরত উমরের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, ইনি সেই الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (অর্থাৎ শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত) ব্যক্তি।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৬৭) (উমদাতুল কারি শারাহ সহীহুল বুখারী, খণ্ড-১৬, পৃ: ২৭৯)

এ সম্পর্কিত ঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন, হযরত উমর এর একটি ঘটনা রয়েছে। হযরত উসমান বলেন, আমি একবার বাইরে তাঁবুতে বসে ছিলাম। এত তীব্র গরম পড়েছিল যে, দরজা খোলারও সাহস ছিল না। তখন আমার দাস আমাকে বলে, দেখ এই তীব্র গরমে বাইরে এক ব্যক্তি ঘোরাফেরা করছে। আমি পর্দা সরিয়ে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম যার চেহারা তীব্র গরমের কারণে ঝলসে গিয়েছিল। আমি তাকে বললাম, কোন মুসাফির হবে হয়ত। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঐ ব্যক্তি আমার তাঁবুর কাছে আসে এবং আমি দেখি তিনি হলেন হযরত উমর (রা.)। তাকে দেখেই বিচলিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে বলি, 'এখন এই গরমে আপনি বাইরে কেন?' হযরত উমর বলেন, বাইতুল মালের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল যার সন্ধানে আমি বাইরে ঘুরছি।"

(তফসীর কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩১৪-৩১৫)

এই উট হারিয়ে যাওয়ারও একটি ঘটনা রয়েছে যা পূর্বেও বর্ণনা করেছি।

হযরত উমর একবার বাইতুল মালের সম্পদ বণ্টন করছিলেন। তখন তার এক মেয়ে আসে এবং ঐ সম্পদ থেকে একটি দিরহাম হাতে তুলে নেয়। হযরত উমর তার কাছ থেকে সেটি নেওয়ার জন্য উঠেন। তাঁর এক কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যায় আর সেই শিশু সন্তান কাঁদতে কাঁদতে গৃহে চলে যায় আর সেই দিরহামটি মুখে পুরে নেয়। হযরত উমর আঙ্গুল ঢুকিয়ে তার মুখ থেকে সেই দিরহামটি বের করেন এবং সেটিকে যথাস্থানে রেখে দেন। অতঃপর তিনি বলেন, হে লোকসকল! উমর এবং তার বংশের জন্য, তারা দূরের হোক বা নিকটের, ততটুকুই অধিকার আছে যতটা সাধারণ মুসলমানদের আছে, এর অধিক নেই। আরেকটি বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত আবু মুসা একবার বায়তুল মালে ঝাড়ু দিচ্ছিলেন। তখন তিনি একটি দিরহাম পান। হযরত উমরের এক শিশু সন্তান সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি তাকে সেটি দিয়ে দেন। হযরত উমর বাচ্চার হাতের সেই দিরহামটি দেখে ফেলেন। তিনি সেটি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে এটি আমাকে আবু মুসা দিয়েছে। এটি বাইতুল মালের সম্পদ তা অবগত হওয়ার পর হযরত উমর বলেন, হে আবু মুসা! তোমার দৃষ্টিতে মদিনাবাসীদের মধ্যে উমরের পরিবারের চাইতে অধিক তুচ্ছ ঘর আর কোনটি ছিল না? তুমি কি চাও যে, উম্মতে মুহাম্মদিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তি আমার কাছে সেই দিরহাম দাবি করুক! এরপর তিনি সেই দিরহাম বাইতুল মালে ফিরিয়ে দেন।

(ইযালাতুল খাফা আনিল খিলাফাহ, অনুবাদ: ইশতিয়াক আহমদ সাহেব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৬, কাদীম কুতুব খানা, আরামবাগ, করাচী)

জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা.) জনসাধারণের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য অনেক কাজ করেছেন।

কৃষিখাতে উন্নতি এবং জনসাধারণের পানি সরবরাহের জন্য যেসব খাল তিনি খনন করিয়েছেন সেগুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

আবু মুসা খাল: যেটি দজলা নদী থেকে নয় মাইল দীর্ঘ খাল খনন করে বসরা পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়। মা'কাল খাল: এই খাল দজলা নদী থেকে বের করা হয়েছিল। আমীরুল মু'মিনীন খাল: হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশে নীল নদকে লোহিত সাগরের সাথে সংযুক্ত করা হয়। ১৮ হিজরী সনে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন হযরত উমর (রা.) হযরত আমর বিন আস (রা.)-কে সাহায্যের জন্য চিঠি লিখেন। দূরত্ব বেশি থাকায় সাহায্য পৌঁছতে বিলম্ব হয়। হযরত উমর (রা.) হযরত আমরকে ডেকে বলেন, নীল নদকে সমুদ্রের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হলে আরবে কখনো দুর্ভিক্ষ হবে না। আমর সেখানকার গভর্ণর ছিলেন, তিনি ফিরে গিয়ে ফুসতাত থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত খাল খনন করান যার মাধ্যমে সামুদ্রিক জাহায মদিনার বন্দর জেদ্দা পর্যন্ত চলে আসতে পারতো। এই খাল ২৯ মাইল দীর্ঘ ছিল যা ছয় মাসে প্রস্তুত করা হয়েছিল। হযরত আমর বিন আস ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি ফরমার নিকট যেখানে লোহিত সাগর এবং ভূমধ্যসাগরের মাঝে ৭০ মাইলের দূরত্ব ছিল সেদিক দিয়ে খাল খনন করে উভয়টিকে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন, ফরমা মিশরের একপ্রান্তে উপকূলবর্তী একটি শহর, কিন্তু হযরত উমর (রা.) গ্রীকদের হাতে হাজীরা লুটতরাজের শিকার হতে পারে- এই শঙ্কায় এই প্রস্তাবে সম্মত হন নি। হযরত আমর বিন আস যদি অনুমতি পেয়ে যেতেন তাহলে সুয়েজ খালের আবিষ্কারও আরবদের কৃতিত্বের অংশ হতো যা পরবর্তীতে বানানো হয়েছিল।

বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ: হযরত উমর (রা.) জনগণের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বা

জনকল্যাণে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করিয়েছেন যেমন, মসজিদ, আদালত, সেনাছাউনি, ব্যারাক, রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন অফিস, সড়ক-মহাসড়ক, সেতু, অতিথিশালা, নিরাপত্তা চৌকি, হোটেল ইত্যাদি। মদিনা থেকে মক্কা পর্যন্ত প্রতি মঞ্জিলে (একদিনের যাত্রাপথ) বা যাত্রা বিরতিস্থলে (কৃত্রিম) ঝরনা ও সরাইখানা বানিয়েছেন। নিরাপত্তা চৌকিও নির্মাণ করিয়েছেন।

(আল ফারুক, প্রণেতা শিবলী নুমানী, পৃ: ২০৬-২১০)

অর্থাৎ নিরাপত্তারও যেন ব্যবস্থা থাকে আর মানুষের বিশ্রাম বা থাকার জন্য হোটেল প্রভৃতি ও পান্থশালা যেন সহজলভ্য হয়।

নগরায়ণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা.) নিজ খিলাফতকালে অনেক নতুন শহর গড়ে তুলেছেন। তিনি এসব শহর আবাদ করার সময় প্রতিরক্ষা আর বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিষয়কে দৃষ্টিপটে রেখেছেন। এসব শহরের স্থান নির্বাচন হযরত উমর (রা.)-এর রণকৌশল সংক্রান্ত দূরদর্শিতা ও ব্যবস্থাপনা এবং জনবসতি গড়ে তোলার বিষয়ে সুক্ষ্মদর্শিতার সাক্ষ্য বহন করে। এসব শহর যুগপৎ যুদ্ধ ও শান্তি পূর্ণ অবস্থাতেও উপযোগী ছিল। হযরত উমর (রা.) অকস্মাৎ আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আরবের যে সীমান্ত অনারব অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত সেসব অঞ্চলে জনবসতি বা শহর গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন। এসব শহরের ভৌগোলিক অবস্থান আরবদের অনুকূলে থাকত বা আরবদের জন্য উপযুক্ত হতো। এসব শহরের একদিকে আরবের ভূমি, যা চারণভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হতো আর অপর দিকে অনারবদের সবুজ-শ্যামল অঞ্চল হতো, যেখানে শস্য, ফলফলাদি এবং অন্যান্য জিনিস পাওয়া যেত, অর্থাৎ কৃষিকাজ অপরদিকে করা হতো। এসব শহর আবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে যেন উভয় অঞ্চলের মাঝে কোন নদী বা সমুদ্র প্রতিবন্ধক না থাকে। হযরত উমর (রা.) বসরা, কুফা, ফুসতাত প্রভৃতি শহর আবাদ করেছেন।

হযরত উমর সুদৃঢ় ও সঠিক ভিত্তিতে এসব শহর আবাদ করেছেন। এসব শহরের সড়ক ও রাস্তাগুলোকে প্রশস্ত রেখেছেন, উন্মুক্ত ও প্রশস্ত সড়ক ছিল আর সর্বকিছু খুবই চমৎকারভাবে সুবিন্যস্ত করেছেন, এসব সুচিন্তিত পদক্ষেপ প্রমাণ করে যে, তিনি এই জ্ঞানে পারদর্শী এবং অনন্য ছিলেন।

(সীরাত আমীরুল মোমেনীন উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা-আস সালাবী, পৃ: ২১৪-২১৭, ২২১, দারুল মারেফা, বেইরুত)

একইভাবে তিনি সেনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছেন। হযরত উমর (রা.) রীতিমত সেনাবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল করেছেন। মর্যাদা ও পদ অনুসারে সেনাবাহিনীর রেজিস্টার প্রস্তুত করিয়েছেন এবং তাদের বেতন নির্ধারণ করেছেন। হযরত উমর (রা.) সৈন্যদের দু'টি দলে বিভক্ত করেছেন। একদল, যারা নিয়মিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন আর অপর দলটি ছিল সেচ্ছাসেবকদের, যাদের প্রয়োজনের সময় ডাকা হতো। সৈন্যদের প্রশিক্ষণের প্রতি হযরত উমর (রা.)-এর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি জোরালো নির্দেশনা জারী করেছিলেন যে, বিজিত দেশসমূহে কেউ যেন চাষাবাদ বা ব্যবসায়িক কোন কাজ না করে। সেনাদের জন্য নির্দেশনা ছিল যে, বিজিত অঞ্চলে কোন ব্যক্তি ব্যবসাবাণিজ্য অথবা চাষাবাদ করবে না, কেননা এর ফলে সৈন্যদের সেনাসুলভ নৈপুণ্যের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। বর্তমান যুগে আমরা মুসলমান রাষ্ট্রসমূহেও দেখি, সৈন্যরা বিভিন্ন ব্যাবসাবাণিজ্যে ব্যস্ত থাকে। বরং কোন এক দেশ সম্পর্কে বলা হয় যে, পূর্বে সৈন্যদের পেশাদারিত্বের যোগ্যতা দেখা হতো এখন কমিশন পেলেই অফিসার দেখে যে, কোথায় নতুন কলোনি তৈরি হচ্ছে, কোথায় নতুন ডিফেন্স কলোনি তৈরি হচ্ছে যেখানে আমি প্লট পাব আর প্লট বরাদ্দ করব। যাহোক, এ কারণেই তাদের সৈনিকসুলভ দক্ষতা হ্রাস পাচ্ছে ।

এরপর গ্রীষ্ণ ও শীতপ্রধান দেশসমূহে আক্রমণের সময় আবহাওয়ার প্রতিও দৃষ্টি রাখা হয় যাতে সৈন্যদের স্বাস্থ্যের কোন প্রকার ক্ষতি না হয়। সৈন্যদের সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) কঠোরভাবে এই দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিলেন যে, সকল সৈন্য যেন সাঁতার, তিরন্দাজি এবং খালি পায়ে হাঁটা শিখে। চার মাস অন্তর অন্তর সৈন্যদের নিজ দেশে গিয়ে নিজ পরিবারবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ছুটি দেওয়া হতো। কষ্ট সহিষ্ণুতার নিমিত্তে এই নির্দেশনা ছিল যে, সৈন্যরা রিকাবের সাহায্যে বাহনে আরোহন করবে না। অর্থাৎ ঘোড়ায় আরোহনের জন্য রিকাবে পা দিয়ে ঘোড়ায় উঠা যাবে না, বরং লাফ দিয়ে উঠতে হবে। নরম মোলায়েম কাপড় পরবে না, রোদ এড়িয়ে চলবে আর হাম্মামে গোসল করবে না, কেননা এতে আরামপ্রিয়তার অভ্যাস হতে পারে। হযরত উমর (রা.) বসন্তকালে সৈন্যদের সবুজশ্যামল অঞ্চলে প্রেরণ করতেন। সেনা ব্যারাক এবং সেনাছাউনি বানানোর সময় আবহাওয়ার বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা হতো। সৈন্যদের সবুজে ঘেরা অঞ্চলে প্রেরণ করা আবশ্যক ছিল যাতে সেখানকার স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় তাদের শরীর-সাস্থ্যও ভালো থাকে। যাহোক, আবহাওয়াকে দৃষ্টিপটে রাখা হতো। সকল জেলাতে সেনানিবাস বানিয়েছেন। সেনাকেন্দ্র হিসাবে মদিনা, কুফা, বসরা, মসুল, ফুসতাত, দামেস্ক, হিমস, জর্ডান, ফিলিস্তিনকে নির্ধারণ করা হয়, যেখানে সবসময় সৈন্য মোতায়েন থাকত। চার মাস অন্তর সৈন্যদের ছুটি দেওয়া হতো। সেনাকেন্দ্রে সব সময় চার হাজার ঘোড়া থাকত যেগুলোর দেখাশুনা করা হতো। ঘোড়ার রানে "জায়শুন ফী সাবীলিল্লাহ্" অর্থাৎ 'আল্লাহর লস্কর' লিখা থাকত। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে মুসলমান সৈন্যরা যুদ্ধাস্ত্রে অনেক উন্নতি করেছে, নতুন নতুন সরঞ্জামাদি সংযোজন করা হয়েছে, যার মধ্যে দুর্গভেদী কামান, মানজানিক এবং দাবাবা ছিল। দাবাবা হচ্ছে সেই অস্ত্র যেটি দিয়ে শত্রুর দুর্গ ভাঙা এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হতো। এর মধ্যে বসে দুর্গের প্রাচীরসমূহে সেঁধ কেটে প্রাচীর গুড়িয়ে দেওয়া হতো। (আল ফারুক, প্রণেতা শিবলী নুমানী, পৃ: ২১৬-২১৮)(সিয়ারুস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২৬, ১২৭, প্রণেতা মাঈনুদ্দীন নাদভী, দারুল ইশাআত করাচী, ২০০৪) (লিসানুল আরব)

ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বিজাতি লোকেরা বড় বড় পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। শুধুমাত্র মুসলমানদেরই বড় বড় পদ দেওয়া হতো না, বরং অমুসলিম এবং ভিন জাতিগোষ্ঠীর লোকদেরও বড় বড় পদ দেওয়া হতো।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.)-এর খলীফাদের যুগেও, যখন কিনা দেশে পূর্ণ নিরপত্তার সাথে জাতিসমূহ বসবাস আরম্ভ করেনি, তখনও এসব অধিকারের স্বীকৃতি ছিল। আল্লামা শিবলী এর উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, হযরত উমর (রা.) যুদ্ধ অধিদপ্তরকে যে বিস্তৃতি দিয়েছিলেন সেক্ষেত্রে দেশ ও জাতির কোন ভেদাভেদ ছিল না, এমনকি জাতি ও ধর্মেরও কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। সেচ্ছাসেবক বাহিনীতে তো হাজার হাজার অগ্নিপূজারী অন্তর্ভুক্ত ছিল, অর্থাৎ এমন লোক যারা খোদাকে মানে না, বরং আগ্নি-উপাসক ছিল, সূর্যের উপাসনাকারীরাও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা মুসলমান সৈনিকদের সমপরিমাণ বেতন-ভাতা পেতো। সামরিক ব্যবস্থাপনায় অগ্নি উপাসকদের অন্তর্ভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়।

অনুরূপভাবে তিনি লিখেন, গ্রীক ও রোমান সাহসী ব্যক্তিরাও সেনাবাহিনীতে ছিল। যেমন মিশর বিজয়ের সময় তাদের পাঁচশত ব্যক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। অথচ আজ পাকিস্তানে বলা হয় যে, আহমদীদেরকে সেনাবাহিনী থেকে বের করে দাও, কেননা এগুলো খুবই স্পর্শকাতর পোস্ট। অথচ ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পাকিস্তানের জন্য আহমদী অফিসাররাই সবচেয়ে বেশি ত্যাগস্বীকার করেছে। যাহোক এটি তো তাদের নিজস্ব কাজ। হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আমর বিন আস যখন ফুসাতাত আবাদ করেন তখন এই বিচ্ছিন্ন স্থানকেও মহল্লারূপে আবাদ করেন। ইহুদিদেরকেও এসব পাড়ায় আবাদ করা হয়। মিশর বিজয়ের সময় তাদের মধ্য হতে এক হাজার লোক ইসলামী সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিল। তদ্রুপ, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, ভিন জাতি-গোষ্ঠীর লোকদেরকে সেনাকর্মকর্তা নিযুক্ত করা হতো। এছাড়া হযরত উমর (রা.)-এর যুগে ইরানীদেরকেও সেনাকর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছে। তাদের কতকের নামও ইতিহাসের পাতায় লিপিবন্ধ আছে। আল্লামা শিবলী ছয়জন অফিসারের নাম লিপিবন্ধ করেছেন। তারা হলেন: সিয়াহ্, খসরু, শাহরিয়ার, শিরভিয়াহ্, শেহেরভিয়াহ্, আফরোদীন। এই অফিসারদের বেতনভাতাও সরকারী কোষাগার থেকে প্রদান করা হতো এবং রীতিমত বেতন স্কেলেও তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতিহাস থেকে সাব্যস্ত হয় যে, খুলাফায়ে রাশেদা বা চার খলীফার পর হযরত মুয়াবিয়ার সময়ে ইবনে আসাল নামের এক খ্রিষ্টান কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিল। এর ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে যে, তফসীরে কবীরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) আল্লামা শিবলীর বরাতে আফরোদীন লিখেছেন। আল-ফারুকেও একইরকম লিখা হয়েছে। কিন্তু আরবী গ্রন্থসমূহে আফরোযীন লিখা হয়েছে, অর্থাৎ 'দাল' এর পরিবর্তে 'যাল' লিখা হয়েছে।

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫৩৪) (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫০৪)

যাহোক , সামান্য নামের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করলাম এজন্য যে, লোকজন এ বিষয় নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে, বাজার নিয়ন্ত্রণ ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ-এর ক্ষেত্রে অবৈধভাবে মূল্যপতনকেও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে আর হযরত উমর (রা.) এই আইন মানিয়েছেন। এ সম্পর্কে অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য কমানোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ইসলাম অবৈধপন্থায় পণ্যের মূল্যপতন করতেও নিষেধ করেছে। মূল্যপতনও অবৈধ অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হয়ে থাকে। কেননা এই পন্থায় শক্তিশালী বা বড় ব্যবসায়ীরা ছোট ব্যবসায়ীদেরকে স্বল্পমূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য করে আর এভাবে তাদেরকে দেউলিয়া করে দিতে পারে। হযরত উমর (রা.)-এর যুগের একটি ঘটনা, একবার

যুগ খলীফার বাণী

পরকালের বিষয়ে চিন্তিত এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের ইবাদতের হিফাযতের বিষয়ে মনোযোগী হয়।

(খুতবা জুমা, ৪ঠা অক্টোবর, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

তিনি (রা.) বাজার পরিদর্শন করছিলেন। এমন সময় বাহির হতে আগত এক ব্যক্তিকে দেখেন যে, সে শুকনো আঙ্গুর অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করছে, যে মূল্যে বিক্রয় করা মদিনার ব্যবসায়ীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি (রা.) তাকে নির্দেশ দেন যে, হয় তোমার পণ্য বাজার থেকে তুলে নিয়ে যাও নতুবা সেই মূল্যেই পণ্য বিক্রয় কর যে মূল্যে মদিনার ব্যবসায়ীরা বিক্রয় করছে। মদিনার ব্যবসায়ীরা পণ্যের অধিক মূল্য নিচ্ছিল না, বরং তাদের ব্যয়ের নিরিখে ন্যায্য মূল্যই নিচ্ছিল। তিনি (রা.) বলেন, এই মূল্যেই বিক্রয় কর। তাঁকে এই নির্দেশের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, সেই ব্যক্তিকে যদি এভাবে পণ্য বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে মদিনার ব্যবসায়ীরা, যারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় করছে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই, কতিপয় সাহাবী হযরত উমর (রা.)-এর এই কাজের বিপরীতে মহানবী (সা.)-এর এই উক্তিও উপস্থাপন করেছিল যে, বাজারমূল্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, কিন্তু তাদের এই আপত্তি সঠিক ছিল না, কেননা বাজারমূল্যে হস্তক্ষেপ করার অর্থ হচ্ছে উৎপাদন এবং চাহিদার নীতিতে হস্তক্ষেপ না করা, অর্থাৎ সরবরাহ ও চাহিদার নীতিতে হস্তক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে। আর এমনটি করা নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর সাব্যস্ত হয় এবং এমন করা থেকে সরকারের বিরত থাকা উচিত। চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে বাজার নিজেই নিজের সমন্বয় করে নেয়। অন্যথায় যদি [বাজারকে চাহিদা ও যোগান নিয়ন্ত্রণের] অনুমতি দেওয়া না হয়, তাহলে জনসাধারণের কোন উপকার হবে না এবং ব্যবসায়িরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

(ইসলাম কা ইকতিসাদী নিযাম, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ৫৩)

কিন্তু দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বৈধ। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরেক স্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে তুলে ধরেছেনযে, নাগরিক অধিকারের মাঝে এটিও অন্তর্ভুক্ত যেন আদান-প্রদানের [বা ক্রয়-বিক্রয়ের] বিষয়ে অসঙ্গতি না থাকে। আমরা দেখতে পাই, ইসলাম এ অধিকারও উপেক্ষা করে নি। বস্তুত ইসলাম দর বৃদ্ধি করতে এবং চড়া দরে ক্রয়-বিক্রয় করতে বারণ করেছে। অনুরূপভাবে অন্যের লোকসান করাতে এবং তাদের ব্যবসা লাটে উঠানোর জন্য দরপতন ঘটাতেও নিষেধ করেছে। প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে মূল্য কমিয়ে দেওয়াও নিষিদ্ধ। একবার মদিনায় এক ব্যক্তি এমন মূল্যে আঙ্গুর বিক্রি করছিল, যে মূল্যে অন্য দোকানিদের পক্ষে বিক্রি করা সম্ভব ছিল না। হযরত উমর (রা.) তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেই ব্যক্তিকে তিরস্কার করেন, কেননা এভাবে অন্য দোকানিদের লোকসান হচ্ছিল। মোটকথা ইসলাম মূল্য বৃদ্ধি করতেও বারণ করেছে এবং দরপতন ঘটাতেও নিষেধ করেছে, যেন দোকানিদেরও লোকসান না হয়, কিংবা জনসাধারণেরও ক্ষতি না হয়।

(তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩০৭)

শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা.) শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তিনি সারা দেশে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। বড় বড় আলেম সাহাবীদের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয় এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতাও নির্ধারণ করা হয়।(আল ফারুক, প্রণেতা শিবলী নুমানী, পৃ: ২৩৩)

অনুরূপভাবে হিজরী ক্যালেন্ডারের সূচনা সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে রয়েছে। এগুলোর একটি সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েত; হযরত সাহল বিন সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন যে, সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর নবুওয়্যত-প্রাপ্তির সময় থেকে তারিখ গণনা করেন নি, কিংবা তাঁর মৃত্যুর সময় থেকেও না; বরং তাঁর মদিনায় আগমনের সময় থেকে তারা তারিখ গণনা করেছেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিবিল আনসার, হাদীস-৩৯৩৪)

অর্থাৎ হিজরতের সময় থেকে (তারিখ গণনা শুরু করেন)।

বুখারী শরীফের শারেহ্ (ভাষ্যকার) আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী বলেন, ইমাম সুহায়লীর মতে সাহাবীরা হিজরতের সময় থেকে তারিখ গণনা শুরু করার ধারণা আল্লাহ্ তা'লার বাণী لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ - আয়াত থেকে নিয়েছেন। অতএব 'মিন আওয়ালে ইয়াওমিন'- এর অর্থ সেই দিনটি, যেদিন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা মদিনায় পদার্পণ করেন। আল্লাহ্ই ভালো জানেন প্রকৃত সত্য কী। হিজরি ক্যালেন্ডারের প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিল- এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। হযরত আবু মুসা (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে লিখেন, আপনার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে তারিখবিহীন চিঠিপত্র এসে থাকে। এ প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা.) মানুষকে পরামর্শের জন্য একত্র করেন। আল্লামা ইবনে হাজর বলেন, ইমাম বুখারী কিতাবুল আদব-এ এবং ইমাম হাকেম, মায়মুন বিন মেহরানের বরাতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে একটি চেক উপস্থাপন করা হয় যার মেয়াদ ছিল শাবান মাস পর্যন্ত। তিনি (রা.) বলেন, এটি কোন শাবান? এটি কি সেই (শাবান) যা অতিবাহিত হয়ে গেছে, অথবা যা আমরা অতিবাহিত করছি নাকি সেই শাবান যা আগামীতে আসবে? তিনি (রা.) বলেন, মানুষের জন্য কোন তারিখ নির্ধারণ কর যা সবার জানা থাকবে।

ইবনে সীরিন বলেন, এক ব্যক্তি ইয়েমেন থেকে এসে বলে, আমি ইয়েমেনে একটি বিষয় দেখেছি যাকে তারা তারিখ বলে; তারা এটি এভাবে লিখে- অমুক সন এবং অমুক মাস। হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি খুবই ভালো পন্থা, তোমরাও তারিখ লিখ।

হিজরী পঞ্জিকার সূচনা কে করেন সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। প্রথম বক্তব্য অনুসারে মহানবী (সা.) তারিখ নির্দিষ্ট করার নির্দেশ দেন আর রবিউল আউয়াল মাসে তারিখ লিখা হয়। ইমাম হাকেম তার পুস্তক 'আল ইকলীল' -এ ইবনে শিহাব যুহরীর বরাতে বর্ণনা করেছেন, أَنَّ النَّبِيَّ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ أَمَرَ بِالتَّارِيْخِ فَكُتِبَ فِيْ رَبِيْعِ الْأَوَّلِ। অর্থাৎ, মহানবী (সা.) যখন মদিনায় আসেন তখন তিনি (সা.) তারিখ লেখার নির্দেশ দেন, অতএব এটি রবিউল আউয়াল মাসে লিখা হয়েছে। আল্লামা ইবনে হাজর বলেন, এই হাদীসটি 'মু'আযযাল'।মু'আযযাল সেই হাদীসকে বলা হয় যার বর্ণনার ক্রমধারায় পর পর দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারী অগ্রহণযোগ্য থাকে। অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তারিখ লেখার সূচনা সেই দিন থেকে হয়েছে যেদিন মহানবী (সা.) হিজরত করে মদিনায় আগমন করেছিলেন। কিন্তু অধিক প্রচলিত ধারণা এর থেকে ভিন্ন; আর তা হলো, হিজরী পঞ্জিকার সূচনা হয় হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে।

'সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সীরাতি খায়রিল ইবাদ'-এর প্রণেতা মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী সাহেব বলেন, ইবনে সালাহ্ বলেছেন, তিনি আবু তাহের মাহ্মাশ প্রণীত পুস্তক আশ্ -শুরুদ'-এ এটি লিখিত দেখেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তারিখ লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন,কেননা তিনি (সা.) যখন নাজরানের খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে পত্র লিখার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন হযরত আলীকে বলেছিলেন, এতে লিখ- 'লে-খামসি মিনাল হিজরাতে' অর্থাৎ হিজরতের অব্যবহিত পাঁচ বছর পর। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে (ইসলামী) তারিখের প্রথম প্রবর্তক হলেন রসূলুল্লাহ্ (সা.), আর হযরত উমর (রা.) এক্ষেত্রে তাঁর অনুকরণ করেছেন। অপর একটি ভাষ্য অনুসারে ইয়েমেনের অধিবাসী হযরত ইয়া'লা বিন উমাইয়া (ইসলামী) তারিখ লেখা আরম্ভ করেন। এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, কিন্তু এতে আমার এবং ইয়া'লার মাঝে 'ইনকেতা' (অর্থাৎ বর্ণনাকারীর ক্রমধারা ছিন্ন) হয়েছে। তৃতীয় ও প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, হিজরী পঞ্জিকার সূচনা হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে হয়েছিল।

হিজরী পঞ্জিকার সূচনা কেন হিজরত থেকে করা হয়- এ সম্পর্কে এই বর্ণনা পাওয়া যায় যে, হযরত উমর (রা.) যখন সাল নির্ধারণের বিষয়ে পরামর্শ আহ্বান করেন তখন একটি পরামর্শ ছিল, মহানবী (সা.)-এর জন্মের সাল থেকেই এর সূচনা করা হোক। দ্বিতীয় মত ছিল, তাঁর (সা.) নবুওয়্যত প্রাপ্তির বছর থেকে এর সূচনা করা হোক। তৃতীয় মত ছিল, তাঁর (সা.) মৃত্যুর বছর থেকে এটি আরম্ভ করা হোক; আর চতুর্থ মতটি ছিল, তাঁর (সা.) হিজরতের বছর থেকে এর সূচনা করা হোক। হিজরতের বছর থেকেই এর সূচনা করাকে সংগত মনে করা হয়, কেননা জন্ম ও নবুওয়্যত লাভের বছর সম্পর্কে মতভেদ ছিল। তিরোধানের বছরকে এতদুদ্দেশ্যে নির্বাচন না করার কারণ হলো মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের কারণে মুসলমানদের দুঃখ বেদনার দিকটি তাতে অন্তর্নিহিত ছিল। অতএব সাহাবীরা হিজরতের বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন।

সাহাবীরা রবিউল আউয়ালের পরিবর্তে মুহাররম মাস দিয়ে বছরের সূচনা কেন করেছিলেন? এর কারণ হলো, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মুহাররম মাসেই হিজরতের ব্যাপারে মনস্থির করে নিয়েছিলেন। যিলহজ্জ মাসে আকাবার দ্বিতীয় বয়আত হয়ে গিয়েছিল আর সেটিই ছিল হিজরতের গোড়াপত্তন। এভাবে আকাবার দ্বিতীয় বয়আত ও হিজরতের দৃঢ় সংকল্প করার পর যে মাসের চাঁদ উদিত হয় তা ছিল মুহাররম মাসের চাঁদ। এজন্য এটিকেই সূচনাক্ষণ নির্ধারণ করাকে সংগত মনে করা হয়। আল্লামা ইবনে হাজর বলেন, ইসলামী পঞ্জিকার সূচনা মুহাররম মাস দ্বারা আরম্ভ হওয়ার ক্ষেত্রে আমার নিকট এটিই সবচেয়ে শক্তিশালী দলীল।

(ফতহুল বারী লি ইবনে হাজর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩১৪-৩১৫) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রুশশাদ, ১২ খণ্ড, পৃ: ৩৬-৩৭)

মহানবী (সা.) মদিনায় কবে আগমন করেন- এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তিনি (সা.) বিভিন্ন স্থানে যাত্রা বিরতি দিয়ে (অবশেষে) ১২ই রবিউল আউয়াল ১৪ নববী মোতাবেক ২০ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনার নিকটে পৌঁছন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এটি ছিল ৮ রবিউল আউয়াল। কারো কারো মতে তিনি (সা.) সফর মাসে বের হন এবং রবিউল আউয়াল মাসে পৌঁছেন। ১লা রবিউল আউয়াল তিনি (সা.) মক্কা থেকে হিজরত শুরু করেন আর ১২ রবিউল আউয়াল মদিনায় পৌঁছন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২৪৩, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ) (শারাহ যারকানী আলা মোয়াহিবুল লাদানিয়া, ২য় ভাগ, পৃ: ১০২)

হিজরী সনের প্রবর্তন কোন বছর হয়েছিল, অর্থাৎ এই পঞ্জিকা কখন

থেকে শুরু হয়েছিল– এ সম্পর্কেও বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কিছু লোক বলে এটি ১৬ হিজরী সনে হয়েছিল, কারো কারো মতে ১৭ হিজরী সন থেকে শুরু হয়, কেউ কেউ বলে ১৮ হিজরীতে হয়, আবার কারো কারে মতে ২১ হিজরীতে শুরু হয়েছে। (ফতহুল বারি লি ইবনে হিজর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩১৫) (আল কামিলু ফিততারিখ লি ইবনে আসীর, ১ম ভাগ, পৃ: ১৩) (আল ফারুক, প্রণেতা শিবলী নুমানী, পৃ:২৪৮, ইদারা ইসলামিয়াত, করাচি, ২০০৪)

কিন্তু অধিকাংশই এ বিষয়ে একমত যে, হযরত উমর (রা.)-এর যুগেই এই পঞ্জিকার প্রবর্তন হয়েছিল।

ইসলামী মুদ্রা: সাধারণ ঐতিহাসিকদের মতে আরবে সর্বপ্রথম মুদ্রা চালু করেন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান। পবিত্র মদিনার কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, সর্বপ্রথম ইসলামী মুদ্রা হযরত উমর (রা.)-এর যুগে চালু হয়েছিল। সেগুলোর ওপর 'আলহামদুলিল্লাহ্' খোদাই করাছিল এবং কোন কোনটির উপর 'মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্' এবং কতকের উপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুওয়াহদাহু'-ও খোদিত থাকত। কিন্তু সাসানী, অর্থাৎ ইরানী রাজা বাদশাহদের ছবির বিষয়ে কোন বিতর্ক করা হয় নি। এক গবেষণা অনুসারে সর্বপ্রথম ইসলামী মুদ্রা ১৭ হিজরী সনে দামেস্কে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলোর ওপরও বাইজেন্টাইন সম্রাটদের ছবি আর লাতিন ভাষায় তাদের লেখা লিপিবদ্ধ থাকত। আরেকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে ২৮ হিজরী সনে সর্বপ্রথম নিজেদের মুদ্রা ব্যবহৃত হয়েছে। সাময়িকভাবে সাসানীদের অঞ্চলে প্রচলিত মুদ্রাই ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলোর উপর সাসানী বাদশাহদের ছবি থাকত। কিন্তু সেগুলোর ওপর কুফার লিখন পদ্ধতিতে বিসমিল্লাহ্ লিখে দেওয়া হয়েছিল।

(আল ফারুক, প্রণেতা শিবলী নুমানী, পৃ:৩১০, ইদারা ইসলামিয়াত, করাচি, ২০০৪) (জুস্তজুয়ে মাদীনা, পৃ: ৩১০, প্রণেতা আব্দুল হামীদ কাদরী)

পরের বিষয় হলো হযরত উমর (রা.) কী কী বিষয়ের সূচনা করেন। কোন কোন জিনিসকে আওয়ালিয়াতে ফারুকী বলা হয়। আল্লামা শিবলী নোমানী তাঁর পুস্তক 'আল ফারুক'– এ লিখেছেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা.) যেসব নতুন বিষয়ের সূচনা করেছেন সেগুলোকে ঐতিহাসিকরা একত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন আর সেগুলোকে আওয়ালিয়াত বলা হয় এবং সেগুলো নিম্ন রূপ– অর্থাৎ, তিনি এগুলোর সূচনা করান।

(১.) বায়তুল মাল তথা অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন। ২. আদালত প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাজী বা বিচারক নিযুক্ত করেন। ৩. তারিখ ও সনের (হিসাব) প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। ৪. হযরত উমর যুগ-খলীফার জন্য 'আমীরুল মু'মিনীন' উপাধি অবলম্বন করেন। ৫. সেনা-অধিদপ্তরের সূচনা করেন। ৬. স্বেচ্ছাসেবীদের বেতন নির্ধারণ করেন। ৭.অর্থ -দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। ৮. পরিমাপ ব্যবস্থা চালু করেন। ৯. আদমশুমারি করান। ১০. খাল খনন করান। ১১. শহর গড়ে তোলেন, অর্থাৎ কুফা, বসরা, জিযা, ফুসতাত, মুসাল প্রভৃতি। ১২. অধিকৃত দেশগুলোকে প্রদেশে বিভক্ত করেন। ১৩. ওশুর, অর্থাৎ এক দশমাংশ কর বা শুল্ক নির্ধারণ করেন। ওশুর হযরত উমর (রা.)-এর উদ্ভাবন, যার সূচনা এভাবে হয় যে,যেসব মুসলমান ভিন দেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে যেতেন সেখানে তাদের কাছ থেকে সেখানকার রীতি অনুযায়ী ব্যবসায়িক সম্পদের ওপর এক দশমাংশ শুল্ক নেওয়া হতো। হযরত আবু মুসা (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে এ বিষয়ে অবগত করেন। তখন হযরত উমর (রা.) নির্দেশ জারি করেন যে, সেসব দেশের ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশে এলে তাদের কাছ থেকেও সমপরিমাণ শুল্ক নেওয়া হোক, অর্থাৎ তাদের কাছ থেকেও এক-দশমাংশ আদায় করা হোক। ১৪. নদীর পানি হতে সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের ওপর কর ধার্য করেন এবং শুল্ককর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। ১৫. যুদ্ধাস্ত্র ব্যবসায়ীদের দেশে আসার এবং ব্যবসা করার অনুমতি দেন। ১৬. জেলখানা স্থাপন করেন। ১৭. চাবুক (মারার আইন) প্রয়োগ করেন। ১৮. রাতেটহল দিয়ে প্রজাদের খোজখবর নেওয়ার পন্থা উদ্ভাবন করেন। ১৯. পুলিশ বিভাগ চালু করেন। ২০. বিভিন্ন স্থানে সেনাছাউনি স্থাপন করেন। ২১. ঘোড়ার জাতে আসীল ও মুজান্নাসের পার্থক্য নির্ণয় করান, যা তখন পর্যন্ত আরবে (প্রচলিত) ছিল না। ২২. সাংবাদিক নিযুক্ত করেন। ২৩.মক্কা থেকে মদিনার পথে মুসাফিরদের বিশ্রামের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করান। ২৪. অনাথ শিশুদের প্রতিপালনের জন্য প্রাত্যহিক ভাতা নির্ধারণ করেন। ২৫. বিভিন্ন শহরে অতিথিশালা নির্মাণ করান। ২৬. আরববাসীরা কাফের হলেও তাদেরকে দাস বানানো যাবে না– এই নিয়ম চালু করেন। ২৭. দরিদ্র খ্রিস্টান ও ইহুদিদের জন্য দৈনিক ভাতা নির্ধারণ করেন। ২৮. বিভিন্ন পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ২৯. শিক্ষক ও পাঠদানকারীদের মাসিক বেতন নির্ধারণ করেন। ৩০. হযরত আবু বকর (রা.)-কে জোর দিয়ে পবিত্র কুরআন সুবিন্যস্ত করতে সম্মত করেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে এই কাজ সম্পন্ন করেন। ৩১. পরিমাপের নীতি নির্ধারণ করেন। ৩২.অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের ক্ষেত্রে অউল-এর প্রথা প্রচলন করেন, অর্থাৎ ভরণপোষণের জন্য কোন কোন ব্যক্তিকে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা। ৩৩. বাজামা'ত তারাবির নামাযের প্রচলন করেন। ৩৪. তিন তালাককে, যা একত্রে প্রদান করা হতো, তিনি 'তালাক-এ-বায়েন' আখ্যায়িত করেন, এটি তিনি শাস্তিস্বরূপ করেছিলেন। ৩৫. মদপানের ইসলামী শাস্তি হিসেবে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন। ৩৬. ব্যানিজ্যিক ঘোড়ার জন্য যাকাত নির্ধারণ করেন। ৩৭. বনু সালেব গোত্রের খ্রিস্টানদের ওপর জিযিয়া করের পরিবর্তে যাকাত নির্ধারণ করেন। ৩৮. ওয়াকফ তথা জীবন উৎসর্গের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ৩৯. জানাযার নামাযে চার তাকবীরে সবাইকে ঐকমত্য করান। এমনিতে সাধারণ রীতি এটিই যে, তিন তাকবীর হয়ে থাকে। অথবা প্রথম তাকবীরসহ শেষ তাকবীর পর্যন্ত, অর্থাৎ সালাম ফিরানোর পূর্ব পর্যন্ত চারটি তকবীর হয়ে থাকে। এখনও এটিই প্রচলিত আছে। ৪০. মসজিদসমূহে ওয়াজ এর পদ্ধতি প্রচলন করেন। আর তাঁর অনুমতিতে তামীম দারি ওয়াজ করেন, যা ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ওয়াজ। ৪১. ইমাম এবং মুয়াজ্জিনদের বেতনভাতা নির্ধারণ করেন। ৪২. মসজিদ সমূহে ১১রাতে আলোর ব্যবস্থা করেন। ৪৩. ব্যঙ্গ করার শরীয়তসম্মত শাস্তি নির্ধারণ করেন। ৪৪. কবিতায় মহিলাদের নাম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, অথচ এই রীতি দীর্ঘকাল থেকে আরবে প্রচলিত ছিল। আল্লামা শিবলী লিখেন, এছাড়াও হযরত উমরের আরো অনেক অবদান রয়েছে যেগুলোকে আমরা কথা দীর্ঘায়িত হওয়ার ভয়ে লিপিবব্ধ করছি না।

(আল ফারুক, প্রণেতা শিবলী নুমানী, পৃ:৪০১-৪০৩,২১২, দারুল ইশাআত, করাচি, ১৯৯১)

যাহোক এই স্মৃতিচারণ এখনও অব্যাহত আছে। আগামীতেও ইনশাআল্লাহ্ এধারা অব্যাহত থাকবে। এখন আমি কতিপয় প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। আর এরপর অর্থাৎ নামাযের পর (তাদের গায়েবানা) জানাযার নামাযও পড়াব।

প্রথম স্মৃতিচারণ হলো ইন্দোনেশিয়ার জনাব সারপিতো হাদী সিসওয়ো সাহেবের। তিনি গত মাসে ৭৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। তিনি ২১ বছর বয়সে বয়আত করেছিলেন আর এরপর খুবই অবিচলতার সাথে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। মরহুম স্ত্রী ছাড়াও আট সন্তান স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রেখে গেছেন। তার এক পুত্র মুবাল্লেগ হিসেবে জামা'তের সেবা করছেন। মরহুম বেশ কয়েকবার জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইন্দোনেশিয়ার দারুল কাযা বিভাগে কাজী হিসেবেও দায়িত্ব পালনের তিনি তৌফিক লাভ করেছেন। তবলীগের একান্ত আগ্রহ ছিল। একজন সক্রিয় দাঈ ইলাল্লাহ্ ছিলেন। যে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে তার তবলীগের স্পৃহা কখনো নিঃশেষ হয়নি। তার পুত্র মুরব্বী আরওয়ান হাবীবুল্লাহ্ সাহেব বলেন, বহুবার এমন হয়েছে যে, মোটর সাইকেল কারো বাসায় রেখে তবলীগের উদ্দেশ্যে বহু কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতেন। ভিন্নগ্রামে যাওয়ার জন্য নদনদী ও পাহাড় পর্বত পাড়ি দিতে হলেও দিতেন। সফর অনেক কষ্টকর ছিল। আমাদের পিতা অনেক পরিশ্রমী ও কষ্ট সহ্যকারী মানুষ ছিলেন। তিনি যখন শিক্ষক হিসেবে চাকরি করতেন তখন তিনি স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছে আবেদন করেন যেন তার পাঠদানের দায়িত্ব চার দিনের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়, অর্থাৎ স্কুলে যতগুলো ক্লাস তার ছিল সেগুলো যেন চার দিনে সম্পন্ন হয়ে যায় আর বাকি দিনগুলো যেন তিনি ছুটি করতে পারেন, যাতে করে তবলীগের জন্য অধিক সময় হাতে পাওয়া যায়। বৃহস্পতিবার স্কুলের কাজ শেষে সোজা তবলীগের উদ্দেশ্যে চলে যেতেন আর রবিবার সন্ধ্যায় ঘরে ফিরতেন, বরং কখনো কখনো সোমবার সকালে ঘরে ফিরে আসতেন।

মুরব্বী সিলসিলা বাশারত আহমদ সাহেব লিখেন যে, মধ্য জাভায় ওনোসোভো অঞ্চলে দশটি জামা'ত তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সকল অবস্থায় বিশেষভাবে তাহাজ্জুদ পড়তেন। সকল স্তরের মানুষের সাথে খুবই সম্মান ও নম্রতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। একবার তিনি বলেন, আমার বাসনা হলো (জীবনের) শেষ দিন পর্যন্ত যেন তবলীগের কাজে ব্যস্ত থাকি। এরই মাঝে আমার আনন্দ এবং আমার স্বাস্থ্যের চাবি ছিল। মুরব্বী সিলসিলা আহমদ হেদায়েতুল্লাহ্ সাহেব বলেন, মরহুম একজন সাহসী দাঈ ইলাল্লাহ্ ছিলেন। বিরোধীদের পক্ষ থেকে হুমকি দেয়া হলে কখনো ভীত হতেন না আর খবুই দৃঢ়তার সাথে তাদের মোকাবিলা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে মাগফিরাত ও কৃপার আচরণ করুন এবং মর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ চৌধুরী বশীর আহমদ ভাট্টি সাহেবের, যিনি নানকানা জেলার গোড়ুর আল্লাহ্ দাদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত মাসে ৯৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। তার ছেলে তানজানিয়ার মুরব্বী সিলসিলা মুহাম্মদ আফযাল ভাট্টি সাহেব বলেন, তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন। নামায-রোযায় অভ্যস্ত, ন্যায়পরায়ণ ও স্বচ্ছভাষী ছিলেন। আহমদীয়াত এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। শিশুকাল থেকেই কাদিয়ান জলসায় যেতেন। গ্রামে তাবিযকবযকারীদেরকে মানুষ বড় ভয় পেত। এটি আমাদের দেশে সাধারণ রীতি। তিনি তাদেরকে বলতেন যে, এসব মানুষকে ভয় পেয়ো না, কেননা তারা খোদা তা'লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু গ্রামের লোকেরা তাকে বলত, আপনারা আহমদী। এসব জিনিস আপনারা বিশ্বাস ক রেন না বিধায় আপনাদের এতে কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু আমরা এগুলোকে খুব ভয় পাই। ১৯৫৩ সালে যখন দাঙ্গা-ফাসাদ আরম্ভ হয় তখন আহমদীয়াত বিরোধীরা এলাকায় মিছিল বের করে এবং আহমদীদের বাড়িঘরে আগুন লাগানোর ষড়যন্ত্র করে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের তার কতক বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন অ-আহমদী আত্মীয়স্বজন, লোকজন তাদের কাছে যায় আর বলে যে, তোমাদের যেসব আত্মীয়স্বজন আহমদী খামারবাড়িতে থাকে তাদেরকে বুঝিয়ে বল যেন তারা সেখান থেকে চলে যায়, কেননা আমরা আগামীকাল সেখানে আগুন লাগানোর পরিকল্পনা করেছি অথবা তারা যেন আহমদীয়াত ছেড়ে দেয়, নতুবা পরিণাম ভালো হবে না। তার আত্মীয়স্বজন যখন তাকে এটি বুঝায় যে, সাময়িকভাবে আহমদীয়াতকে অস্বীকার কর আর যখন মিছিল চলে যাবে তখন আবার নিজ ধর্মে ফিরে যেও, একথা শুনে তিনি বলেন, আপনারা দুশ্চিন্তা করবেন না। আমরা বুঝেশুনে আহমদী হয়েছি, তাই আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। আমরা আহমদীয়াতের জন্য জীবন দিতে পারি, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও নিজের ঈমান থেকে সরে আসার কথা ভাবতে পারি না। যাহোক, তিনি বলেন, তোমরা যদি কিছু করতে না পার তবে করার প্রয়োজন নেই, আমরা আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবস্থা করেন যে, মিছিল কিছুদূর এসে আপনাআপনিই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তারা আহমদী এলাকায় প্রবেশের সাহস পায় নি।

তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুই কন্যা এবং পাঁচ পুত্র রয়েছে। এক ছেলে হলেন মুরব্বী সিলসিলা মুকাররম আফযাল ভাট্টি সাহেব, যিনি তানজানিয়াতে সেবা করার তৌফিক পাচ্ছেন আর কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে জানাযা ও দাফনকাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তানদেরও তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দিন এবং তার ছেলে, যিনি (জানাযায়) অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, তাকেও ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হামিদুল্লাহ্ খাদেম মালহি সাহেবের, যিনি রাবওয়ার পশ্চিম দারুন্ নসর নিবাসী চৌধুরী আল্লাহ্ রাখখা মালহি সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী চৌধুরী আল্লাহ্ বখশ গুল্লর (রা.)-এর দৌহিত্র এবং মুরব্বী সিলসিলা শহীদ নসরুল্লাহ্ মালহি সাহেবের পিতা ছিলেন। মরহুম নামায-রোযায় অভ্যস্ত, সহজ-সরল, ভদ্র, দরিদ্রদের লালনকারী, নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ আহমদী ছিলেন। চাকরিতে থাকা অবস্থায় তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে বিরোধিতার মোকাবিলা করেছেন। তার এক পুত্র ওয়াকফে যিন্দেগী হিসেবে রাবওয়ার তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট-এ কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ পেশাওয়ার নিবাসী মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের, যিনি শরীফউল্লাহ্ খান সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি ৮৯ বছর বয়সে ঐশী তকদীর অনুযায়ী ইহধাম ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি এক-অষ্টমাংশের ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে ৩ কন্যা ও ৭ পুত্র সন্তান রয়েছে। তার এক কন্যা সেলিমা সাহেবা, যিনি এখানে ইসলামাবাদে বসবাসকারী বুরহান সাহেবের স্ত্রী, তিনি লিখেন, পূর্বে তাদের পরিবার গয়ের মুবায়ে (অর্থাৎ লাহোরী) ছিল, এরপর ১৯৫৪ সনে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন এবং আমৃত্যু জামা'ত ও খিলাফতের সাথে যুক্ত থাকেন আর তার পিতা ধর্মীয় আত্মাভিমান ও জামা'তের সাথে গভীর সম্পৃক্ততা প্রদর্শন করেন। তার পিতা প্রথমে লাহোরী ছিলেন, (এরপর) ১৯৫৪ সনে বয়আত করেছিলেন। যাহোক, এরপর তিনি জামা'তের কাজ করার সুযোগ লাভ করেন, খোদ্দামুল আহমদীয়ার জেলা কায়েদ ছিলেন। এরপর সেক্রেটারী ওসীয়্যত এবং সেক্রেটারী তা'লীমুল কুরআন ইত্যাদিও ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করতেন। পবিত্র কুরআনের প্রতি তার অপরিসীম ভালোবাসা ছিল। সর্বদা তাকে কু রআন পাঠ করতে দেখেছি। পবিত্র কুরআনের অনেক অংশ তার মুখস্থ ছিল। দোয়ায় অভ্যস্ত, পুণ্যবান, অতিথিপরায়ণ, সত্যবাদী ও অবিচল মানুষ ছিলেন। অনেক বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করতেন। মানুষকে অনেক আর্থিক সাহায্যও করতেন। তার এক অ-আহমদী আত্মীয় তাকে বলেন যে, আপনি যদি আহমদীয়াত ত্যাগ করেন তাহলে আমরা আপনার পদতলে উৎসর্গিত হতেও প্রস্তুত আছি। তিনি (অর্থাৎ মরহুমের মেয়ে) বলেন, আমার পিতা তাকে উত্তর দেন যে, তোমাদের কুরবানীর আমার কি প্রয়োজন? আমি তো নিজেই আত্মোৎসর্গ করেছি। এখন আমার কথা শোন! যার আসার কথা তিনি এসে গেছেন, (তাই) মসীহ মওউদ (আ.) -কেগ্রহণ কর এবং নিজেদের জীবনকে নিরাপদ কর। যাহোক, তারা কোন মনোযোগ দেয় নি। ধীরে ধীরে সেসব আত্মীয় -স্বজন (তার) সঙ্গ পরিত্যাগ করে, কিন্তু আহমদীয়াতের সাথে তার সম্পর্ক প্রতিনিয়ত দৃঢ় হতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন। (তার) পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো, আমেরিকার মেরিল্যাণ্ড নিবাসী সাহেবযাদা মাহদী লতীফ সাহেবের, যিনি ৮৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। সাহেবযাদা মাহদী লতীফ সাহেব হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব শহীদ (রা.)-এর পৌত্র আর প্রয়াত সাহেবযাদা মুহাম্মদ তৈয়্যব লতীফ সাহেবের পুত্র ছিলেন। মরহুম সাহেবযাদা মাহদী লতীফ সাহেব আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যত করেছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী গভীর ও ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। (তিনি) পাঁচবেলার নামায ও তাহাজ্জুদ নিয়মিত পড়তেন। আহমদীয়া খিলাফতের প্রেমে বিভোর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং নম্রস্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তার তবলীগ করার গভীর আগ্রহ ছিল। আর সর্বদা অন্যদেরও তবলীগ করার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন আর (তার) পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো, শেহযাদ আকবর সাহেবের পুত্র ফয়যান আহমদ সামীর সাহেবের। শেহযাদ আকবর সাহেব আমাদের রাবওয়াস্থ প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসের কর্মচারী, তিনি (অর্থাৎ ফয়যান আহমদ সামীর সাহেব) তার পুত্র ছিলেন। করোনা আক্রান্ত হয়ে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। প্রখর মেধাবী, স্বল্পভাষী, ভদ্র স্বভাবের নেক ছেলে ছিল। ওয়াকফে নও এর তাহরীকভুক্ত ছিল। নিজের পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী আর অপ্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড, বরং খেলাধুলাতেও খুব কমই অংশ নিত। খুবই গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে ছিল। স্কুলের পর অধিকাংশ সময় বাড়িতেই কাটাতো। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতের পিতামাতাকেও ধৈর্য দিন। প্রয়াতের নানা খাজা আব্দুশ্ শাকুর সাহেবও দীর্ঘদিন জামা'তের সেবা করেছেন। (আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি) ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন, (তার) পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

১ম পাতার শেষাংশ **************************

(ভাবার্থ- খোদার সমীপে প্রাণ বিজর্সন দিলাম ঠিকই, কিন্তু সেই প্রাণও তো তাঁরই গচ্ছিত ধন ছিল। সত্য এই যে, আমি এই ঋণ পুরোপুরি শোধ করতে ব্যর্থ হলাম)

তাই নবী যেহেতু খোদার পরিচয় লাভকারী হয়ে থাকে, সে নিজেকে দেখে এবং উপলব্ধি করে যে, যা কিছু সে করছে, তা সে নয় বরং খোদা স্বয়ং করছেন। এই কারণে নবী দোয়া করে, 'হে আল্লাহ্ আমার সত্তাকে যতটা সম্ভব গোপন রাখ এবং নিজেকে যতবেশি সম্ভব প্রকাশ কর। অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'ইগফিরলি' (আমাকে ক্ষমা কর)-এর অর্থ হল হে খোদা! তোমাকে আমার ভালবাসার দোহাই! তুমি আমাকে অন্তরালে রাখ। অর্থাৎ আমার অস্তিত্বকে মিটিয়ে তোমার অস্তিত্ব যেন আমার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে। আর একথা স্পষ্ট যে বান্দার মাধ্যমে যতবেশি খোদা তা'লার অস্তিত্ব প্রকাশিত হবে, ততবেশি সে নিজের সৎ উদ্দেশ্যসমূহে সফল হবে।

তবে এই শব্দটি যখন অন্য কারো জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন তাদের মর্যাদা অনুসারে এর অর্থ হবে। একজন উচ্চ পদমর্যাদার মোমেন যখন এই শব্দটি ব্যবহার করে তখন এর অর্থ হবে, যে দুর্বলতা পুণ্যের পরাকাষ্ঠা লাভে মানুষকে বঞ্চিত রাখে, তা থেকে আমাকে রক্ষা কর। মধ্যম মানের মোমেনের জন্য যখন এই শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ হবে, আমার দোষত্রুটি গোপন রেখে আমাকে উচ্চমানের উন্নতি করার তৌফিক দাও। আর একজন সাধারণ মোমেন যখন এই শব্দ ব্যবহার করে, তখন এর অর্থ হবে, আমাকে ঈমানের উপর অবিচল রাখ, পাছে আমার পাপসমূহ আমাকে না ডুবায়। আর একজন সত্যসন্ধানী ব্যক্তি যখন এই শব্দটি ব্যবহার করে, তখন এর অর্থ হবে, আমার পাপসমূহ আমাকে হিদায়াত লাভ থেকে বঞ্চিত না রাখে, অতএব, তুমি আমার পাপসমূহ ক্ষমা কর। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই শব্দটির প্রয়োগ ঠিক তেমনই, যেমনটি 'জাব্বার' শব্দ। যখন এটি আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহৃত তখন এর অর্থ সংস্কারক আর এই একই শব্দ যখন মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয়,তখন এর অর্থ অবাধ্য ও আইন অমান্যকারী। স্মরণ রাখা দরকার, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীদের সম্পর্কে বলেছেন- 'আল্লাহু ইয়াজতাবি মির রসুলিহি। কাজেই আল্লাহ্ তা'লা যখন তাদেরকে মনোনীত করেন, সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পাপ কোথা থেকে আসবে? তাদেরকে যখন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে খোদার নিকট বসানো হয়েছে,তবে তাদের কাছে শয়তান কোথা থেকে আসবে? শয়তান তো খোদার নাম শুনেই পালিয়ে যায়। অনুরূপভাবে অন্যত্র বলা হয়েছে إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ অর্থাৎ নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার জোর খাটবে না। কাজেই এটিই যখন নিয়ম যে, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকেও শয়তানের আধিপত্য থেকে রক্ষা করে যে উবুদিয়াতের অতি সাধারণ মানে রয়েছে, সেক্ষেত্রে আম্বিয়া যেখানে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ নিরাপত্তার অধীনে থাকেন, তাদের কাছে শয়তান কিভাবে পৌঁছবে?

(তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৮৯)

জলসায় নিশ্চয় দেখেছেন, ভালবাসা, শান্তি ও সৌহার্দ নিশ্চয় চোখে পড়েছে। আর সারসংক্ষেপ সেটিই- অর্থাৎ= শান্তি কিম্বা প্রতিদান দেওয়ার বিষয়টি খোদার হাতে। খোদা তা'লা এই পৃথিবীতে যাকে মসীহ ও মাহদী করে পাঠিয়েছেন, তাঁকে গ্রহণ করলে ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার লাভ করবে। কাকে কতটা পুরস্কার দিতে হবে তা খোদা তা'লার বিষয়।

* লিথোনিয়া থেকে এক যুবক ছাত্র ইয়াকুবাস বলেন, জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করে আমার মনে হচ্ছে যেন আমিও এই জামাতের অংশ। এখন আমি জীবনের উদ্দেশ্যে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি। হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করে ভীষণ আনন্দিত। আমি তাঁর ব্যক্তিত্বে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি। তিনি অত্যন্ত সহৃদয় ও স্নেহপরায়ণ ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমি অনুভব করলাম, তিনি গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে আমার সঙ্গে কথা বলছেন। ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য আমি অনুধাবন করেছি। আজ আমি বয়আত করে জামাত আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হলাম। আমি প্রায়শ নানান প্রকারের সংশয়ে থাকতাম, কিন্তু এখন আমি ঈমানে দৃঢ়তা এনে বাকি জীবনটুকু অতিবাহিত করার চেষ্টা করব।

* আলি জাসিম নামে একজন সিরিয়ান যুবক বলেন- আলহামদোলিল্লাহ! একটি সত্য জামাত, সত্যবাদীদের জামাত, পরস্পরের প্রতি স্নেহশীল ও অতিথিপরায়ণ মানুষদের জলসা ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ একটি সমাবেশ দেখলাম। আমি এখানে এসে এত মানুষের সমাগম দেখে অভিভুত হই আর জামাত আহমদীয়ার খলীফাকে দেখে অন্তরে এক অবর্ণনীয় পরিবর্তন অনুভব করি যা আমার মনকে ভালবাসায় আপ্লুত করে তোলে। আমি তাঁর চেহারায় জ্যোতির আভা দেখেছি। আমি সত্যের সন্ধানে ছিলাম যা আমি এখানে এসে পেয়েছি। আল হামদোলিল্লাহ। আমি সত্য ও জ্যোতির পথ পেয়ে গেছি। আমি উদার মনে বয়আত করার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি।

* আলবেনিয়া থেকে এক ভদ্রলোক মঙ্গোলিন বার্ক সাহেব বলেন: আমি জামাত আহমদীয়ার ঘোর বিরোধী ছিলাম। আমার ভাই ও এক বন্ধু ইতিপূর্বেই আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আমার ভাই যেন আহমদীয়াতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে, সেজন্য আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখি নি। অবশেষে আমাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয় যে, উভয়ে দোয়া করি। যে সত্য হবে সেই জয়ী হবে। অনবরত দোয়ার পর আমার মন চাইছিল নিজের চোখে একবার জলসা সালনা এবং খলীফাকে দেখে আসি, যাতে যে সিদ্ধান্তই নিই তা যেন অসম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক না হয়। এই উদ্দেশ্যে আমি গত বছর জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলাম। কিছুটা আশ্বস্ত হওয়ার পরও মনের মধ্যে অদ্ভুত অস্থিরতা ছিল। অবশেষে সেই চূড়ান্ত মুহূর্তের সামনে এসে পড়লাম যখন হুযুর আনোয়ারের চেহারা আমার চোখের সামনে এল। নিমেষেই আমার সকল বিদ্বেষ, ঘৃণা, শত্রুতা ও সংশয় মন থেকে মুছে গেল। হুযুরের আশিসমণ্ডিত চেহারা আমার অন্তরে খোদিত হয়ে থেকে যায়। আমার কাছে প্রত্যাখ্যানের আর কোন অবকাশ ছিল না। জলসা থেকে ফিরে গিয়ে আমি বয়আত ফর্ম পুরণ করি। এবছর এসে হুযুরের হাতে বয়আতে করার তৌফিক লাভ করলাম। এরই মাঝে আরও একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমার বাগদত্তা আহমদী হতে চাইছিল না। তাকে অনেক চেষ্টায় এখানে আনতে পেরেছি। লাজনাদের উদ্দেশ্যে হুযুরের ভাষণ শোনার পর সেও তৎক্ষণাৎ আহমদী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার বাগদত্তা বলে, যে জামাতের কাছে এমন সহৃদয়, সহানুভূতিশীল ও স্নেহপরায়ণ খলীফা আছে, সে তো একটি সত্তার কাছেই সমস্ত বরকত পেয়ে গেল। এই জিনিসটি অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে নেই। খুব শীঘ্রই আমরা আহমদী হিসেবে বিয়ে করতে চলেছি।

* ফোয়াদ নাযাল নামে এক সিরিয়ান ভদ্রলোক বলেন, জলসায় আগমণের পূর্বেই এক আহমদী বন্ধুর মাধ্যমে জামাতের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। জামাতের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানার জন্য আমি কয়েকটি পুস্তকও অধ্যয়ন করেছিলাম। এখন আমি সেই আহমদী বন্ধুর সঙ্গে জলসায় অংশগ্রহণ করে একেবারে ভিন্ন ও এবং চিত্তাকর্ষক পরিবেশ দেখতে পেলাম। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভাষা সত্ত্বেও লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছিল। যেন তারা এক ও অভিন্ন জাতি সত্তা। এটি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রসারের বাস্তব রূপ। এমন চারিত্রিক সৌন্দর্য আমি কখনও কোন সমাবেশে লক্ষ্য করি নি। আমার অন্তরে এই বিষয়টি গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। আমি পূর্বেও এম.টি.এ-তে খলীফার খুতবা এবং ভাষণ নিয়মিত দেখতাম, কিন্তু আমি সরাসরি হুযুরের চেহারা দেখার সুযোগ পাওয়ার পর তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। হুযুরের পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাব ও চেহারার জ্যোতি স্পষ্ট ছিল। আমি শনিবার সারা রাত্রি দোয়া করতে থাকি যে, হে আল্লাহ! এই জামাত যদি সত্য হয়, তবে তুমি এই জলসা আমাকে বয়আত করার তৌফিক দান কর। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আন্তরিক প্রশান্তি দানের মাধ্যমে আমার দোয়া কবুল করেছেন আর আমি এই জলসাতেই বয়আত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি, যা কিনা সত্য জামাত এবং ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে। জামাত আহমদীয়া গ্রহণ করায় আমার কোন প্রকার দুঃখ বা আক্ষেপ নেই। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করুন এবং অবিচলতা দান করুন।

জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

* নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক দুইজন জার্মান ভদ্রমহিলা নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: প্রথম বার মুসলমানদের সমাবেশে অংশগ্রহণ করায় আমরা কিছুটা শঙ্কিত ছিলাম। মহিলাদের জন্য নির্ধারিত জলসাগাহেও যাওয়ার সুযোগ আমাদের হয়েছিল, যেখানে যুগ খলীফার বক্তব্যের কিছুটা শুনেছি। আমরা কিছুটা বিলম্বে পৌঁছেছিলাম। পর্দার অন্তরালে থেকে মহিলাদের পৃথকভাবে জলসা শোনা আমার জন্য এক সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল। অনেকে হয়তো এটিকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন, কিন্তু আমরা অনুভব করেছি যে সেখানে অনেক বেশি স্বাধীনতা এবং সম্মান রয়েছে, যেটা পুরুষদের সঙ্গে বসলে সম্ভব নয়। আমি ইসলামকে কেবল একটি উগ্রতা প্রিয় ধর্ম হিসেবে জেনে এসেছি, কিন্তু এখানে এসে দেখলাম সেই চিন্তাধারা একেবারেই ভ্রান্ত। খলীফাতুল মসীহ্র ভাষণে কোন প্রকার উগ্রতা বা প্রতিশোধের বার্তা ছিল না, বরং অত্যন্ত শান্তভাবে মহিলাদেরকে তাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। আমার এখন আক্ষেপও হচ্ছে যে, ইসলামকে আমি অত্যাচারের ধর্ম বলে মনে করতাম। আমরা দুজনে আগামী বছর আবার আসব আর খলীফার ভাষণও শুনব। খৃষ্টান হওয়া সত্ত্বেও আমাদের প্রতি এখানে যে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে তাতেও আমরা যারপরনায় আনন্দিত। সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় এমন অভিজ্ঞতা কখনও হয় নি। আমরা উপলব্ধি করলাম যে, আহমদীয়াতই ইসলামের প্রকৃত রূপ।

* লিথোনিয়া থেকে মি. জারোনিমাস ল্যাকিউস নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি একজন লেখক। এখানে আমি ইসলাম সম্পর্কে নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এসেছি। খোদার একত্ববাদের পাঠ যে ভঙ্গিতে খলীফাতুল মসীহ আমাদেরকে দিয়েছেন তার প্রভাব অনস্বীকার্য। 'কেবল ইবাদত নয়, বরং খোদাকে সন্তুষ্ট করা যেন লক্ষ্য হয়'- তাঁর এই বক্তব্যটি আমার মন জয় করেছে। ফিরে গিয়ে আমি পত্রিকায় জামাত সম্পর্কে স্তম্ভ লিখব এবং জামাত সম্পর্কে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করব। অনুমান করি, এমনটি করলে বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু আমি সত্যের সঙ্গ দিতে চাই। এখানে এসে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ করেছি। খলীফা এবং জামাতের জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

* মি. টমাস কেপাইটিস নামে এক অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি এই জলসার মাধ্যমে প্রথম বার প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হলাম। যদিও আমি চিরকালই ইসলামের মনীষিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছি আর ইউরোপে মুসলমানদের প্রতি হওয়া আচরণ দেখে বিচলিত হয়েছি, তথাপি এই জলসার মাধ্যমে আমি এক নতুন জগতের সঙ্গে পরিচিত হলাম যেখানে পৃথিবীর বর্তমান সমস্যাবলীর সমাধান রয়েছে। আমার মনে হয়, ইসলামের কাছে আমার এখনও অনেক কিছুই শেখার আছে। আমাকে প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। খলীফার সঙ্গে সাক্ষাতকালে তাঁর সরলতা এবং কথার সৌন্দর্য আমি উপভোগ করেছি।

লিথোনিয়া, লাতিভা, স্লোভেনিয়া, এস্টোনিয়া ও কাযাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

লিথোনিয়ার প্রতিনিধি দলের এক সদস্য, যিনি একজন লেখক, প্রশ্ন করেন যে, জামাত আহমদীয়া এই সময় পৃথিবীতে কি কাজ করছে যার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করা যেতে পারে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আহমদীয়া জামাতের লক্ষ্যই হল মানুষকে খোদার নৈকট্য লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং তাকে খোদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল মানুষকে মানবীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে অবগত করা। এটিই ইসলামের মূল শিক্ষা, এই শিক্ষাই জামাত আহমদীয়া পৃথিবীতে প্রসারের চেষ্টা করছে। এই কারণেই জামাত আহমদীয়া সারা পৃথিবীতে জামাত আহমদীয়ার বাণী শোনা হয় এবং সমাদৃত হয়।

(ক্রমশ.....)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family, Barisha (Kolkata)

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে। (২য় পর্ব)

(এতেকাফ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর, গত সংখ্যার পর)

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

(সূরা বাকারা: ১৮৮) অর্থাৎ- রমযানের এতেকাফে প্রথমত সহবাসের অনুমতি নেই, দ্বিতীয়ত এতেকাফে বসার স্থান হল মসজিদ।

মসজিদই যে রমযানের এতেকাফ এর স্থান, সে বিষয়ে হাদীসেও বিশদে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন

السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. (سنن ابی داود)

অনুবাদ: যে ব্যক্তি একেতাফ করে, তার জন্য রুগীর খোঁজ খবর নিতে না যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ না করা, স্ত্রীকে স্পর্শ না করা এবং সহবাস না করাই নিয়ম। আর একান্ত প্রয়োজন না থাকলে- যেটি ছাড়া উপায়ন্তর থাকে না- এমন ব্যক্তি যেন মসজিদের বাইরে না যায়। আর রোযা ছাড়া এতেকাফ করা যথাযথ নয় আর জামে মসজিদ ছাড়া অন্যত্র এতেকাফে বসাও উচিত নয়।

কাজেই কুরআন করীম এবং হাদীস অনুসারে রমযানুল মুবারকের নিয়মসম্মত এতেকাফ হল কম পক্ষে দশ দিনের আর এর জন্য মসজিদেই বসা হয়।

তবে রমযান ছাড়াও অন্যান্য দিনে পুণ্যলাভের আশায় কেউ যদি নিজের বাড়িতে কয়েক দিনের জন্য এতেকাফ করতে চায়, তবে এরও অনুমতি আছে, কোথাও কোন বাধা আছে এমন নির্দেশ পাওয়া যায় না। এছাড়াও কতিপয় ফিকাহবিদ মহিলাদেরকে বাড়িতে এতেকাফ করাকেই শ্রেয় মনে করেছেন। ফিকাহর প্রসিদ্ধ পুস্তক হিদায়া-য় লেখা আছে-

اما المرأة تعتكف فى مسجد بيتها

মেয়েরা বাড়িতে নিজেদের নামাযের জায়গায় এতেকাফে বসতে পারে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন- 'মসজিদের বাইরে এতেকাফ হতে পারে, কিন্তু সেই পুণ্য লাভ হবে না যা মসজিদে লাভ হতে পারে।"

(রোযনামা আলফযল, ৬ মার্চ,১৯৩৬)

প্রশ্ন: অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত ২০১৩ সালের ১২ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত গুলশানে ওয়াকফে নও অনুষ্ঠানে একটি মেয়ে হুযুর আনোয়ারকে জিজ্ঞাসা করে যে মেয়েদের কোন বয়সে স্কার্ফ পরা উচিত? হুযুর আনোয়ার (আ.) এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেন-

উত্তর: তোমাদের বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন তোমাদের লেগিংস ছাড়া ফ্রক পরা উচিত নয়। তোমাদের পা আবৃত থাকা উচিত, যাতে তোমাদের মধ্যে এই চেতনা গড়ে ওঠে যে তোমাদের পোশাক হবে সব কিছু ঢাকা। হাতবিহীন ফ্রক পরা উচিত নয়। এরপর বয়স যখন ছয় বছর হয়, তখন তোমাদের লেগিংস পরার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হতে হবে। আর যখন তোমরা দশ বছরে উপনীত হও, তখন একটু আধটু স্কার্ফ পরা অভ্যাস কর। আর যখন এগারো বছরে পরিণত হও, তখন সম্পূর্ণ স্কার্ফ পর। স্কার্ফ নিতে তো কোন অসুবিধে নেই? এখানেও তো মানুষ শীতকালে স্কার্ফ মাথায় দেয়। শীতে তারা যেভাবে কান ঢেকে রাখে, সেটাকে তো স্কার্ফই বলা হয়। সেই ধরণের স্কার্ফ পর।

অনেক মেয়ে আছে যাদেরকে দশ বছরেও দেখতে ছোট লাগে আর কিছু মেয়ে আছে যাদেরকে দশ বছর বয়সে বারো বছরের বলে মনে হয়, তাদের উচ্চতা বেড়ে যায়। তাই প্রত্যেক মেয়ের দেখা উচিত, যদি তাকে দেখতে বড় লাগে, তবে স্কার্ফ পরা উচিত। ছোট বয়সে স্কার্ফ পরা অভ্যাস করলে লজ্জা লাগবে না, নাহলে সারা জীবন লজ্জা করতে থাকবে। তোমরা যদি ভাব, ১২,১৩ কিম্বা ১৪ বছর বয়সে স্কার্ফ পরবে, তবে ভাবতেই থাকবে, পরে তখন লজ্জা পাবে। পরে তখন বলবে, মেয়েরা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে না তো? আমি স্কার্ফ নিলে মেয়েরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। তাই মাঝে মধ্যে স্কার্ফ নেওয়া অভ্যাস কর। আঠ, নয় বছরে স্কার্ফ নেওয়া শুরু কর আর মেয়েদের সামনেও স্কার্ফ পরবে, যাতে তোমাদের লজ্জাভাব ভাঙে। আর যখন তোমাদেরকে দেখে বড় মনে হয়, তখন পুরো স্কার্ফ ব্যবহার কর। বুঝতে পেরেছো? তোমাদের জন্য এতটাই যথেষ্ট। আর বড় মেয়েদের জন্য এতটাই যথেষ্ট যে, পর্দার উদ্দেশ্য হল, লজ্জাশীলতা থাকা জরুরী। আর যারা ইউরোপিয়ান ও পশ্চিমি প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে, পুরোনো কালে তাদের পরিধানও এতদূর পর্যন্ত হত (হুযুর আনোয়ার নিজের হাতের কব্জি পর্যন্ত ইশারা করে দেখান- সংকলক), দীর্ঘ ম্যাক্সি বা ফ্রক ছিল। এখন তো এরা উলঙ্গা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

প্রশ্ন হল, পুরুষদেরকে তখনই ভাল এবং ওয়েল ড্রেস্ড বলা হল, যখন সে ট্রাউজার পরিহিত থাকে, কোট পরিহিত থাকে, টাই পরিহিত থাকে। আর মেয়েদেরকে তারা বলছে, তোমরা তখনই ওয়েল-ড্রেস্ড হবে, যখন তোমরা মিনি স্কার্ট পরবে। এই যুক্তি আমার বোধগম্য হয় না।

তাই পুরুষদেরকে দেখো না। আর মেয়েরাও নিজেদেরকে উলঙ্গা করে রাখছে, নিজেদের সম্মানহানি করছে। অতএব, নিজেদের লজ্জাশীলতা বজায় রাখার মধ্যেই আহমদী মেয়েদের সম্ভ্রম নিহিত আছে। কেননা লজ্জাশীলতাই হল আসল জিনিস আর এই লজ্জাশীলতাই তোমাদেরকে অপরের কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করে।

প্রশ্ন: অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত ২০১৩ সালের ১২ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত গুলশানে ওয়াকফে নও অনুষ্ঠানে একটি মেয়ে হুযুর আনোয়ারকে জিজ্ঞাসা করে যে, আমরা কোন বয়সে রমযানের রোযা রাখা আরম্ভ করব? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন-

উত্তর: তোমাদের জন্য রোযা সেই সময় আবশ্যক হয়, যখন তোমরা পুরোপুরি পরিণত হও। যদি তোমরা ছাত্র হও, পরীক্ষা চালু থাকে, আর সেই সময় তোমদের বয়স তেরো, চৌদ্দ বা পনেরো বছর হয়, তবে তোমরা রোযা রেখো না। যদি সহ্য করতে পার,তবে পনেরো বছর বয়সে রোযা রাখতে পার। কিন্তু সাধারণভাবে ফরয রোযা সতেরো কিম্বা আঠারো বছরে তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ হয়। এরপর অবশ্যই রোযা রাখা উচিত। এছাড়া শখ করে এক, দুই বা তিন চারটি রোযা রাখতে চাইলে আট-দশ বছর বয়সে রাখতে পারে,তবে তা আবশ্যক নয়। তোমরা বড় হলে তবে তোমাদের উপর রোযা আবশ্যিক হবে, যখন তোমরা রোযা সহ্য করতে পারবে। এখানে (অস্ট্রেলিয়ায়) বিভিন্ন আবহাওয়ায় কতটা পার্থক্য রয়েছে? দিনের আলো কত ঘন্টা থাকে? সেহরী ও ইফতার-এর মাঝে কতটা ব্যবধান থাকেন? বারো ঘন্টা? আর গ্রীষ্মকালে কতটা থাকে? উনিশ ঘন্টা? উনিশ ঘন্টা তোমরা অভুক্ত থাকতে পারবে না। যুক্তরাজ্যেও বর্তমানে- গত গ্রীষ্মে- তোমাদের এখানে অনতিদীর্ঘ রোযা ছিল, আমাদের সেখানে দীর্ঘ রোযা ছিল। সাড়ে আঠারো ঘণ্টার রোযা ছিল। সুইডেন ও সংলগ্ন দেশগুলিতে বাইশ ঘন্টার রোযা হয়। যাইহোক সেখানে সময় নির্ধারণ করতে হয়। কেননা এত দীর্ঘ রোযাও রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু তা সহ্য করার মত তখন হয় যখন তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও, কম করে সতেরো আঠারো বছরের হলে তবেই তা যথাযথ বলে ধরা যাবে। এরপর রোযা রাখ। বুঝেছো? তোমার মা বাবা কি বলেন? দশ বছর বয়সে তোমাদের উপর রোযা ফরয হয়ে গিয়েছে? যাইহোক অভ্যাস কর। ছোটদেরও প্রতি রমযানে দুই-তিনটি করে রোযা রাখা অভ্যাস করা উচিত যাতে তারা বুঝতে পারে যে রমযান আসছে। কিন্তু যদি রোযা নাও রাখ, তবু সকালে উঠে মা-বাবার সঙ্গে সেহরী খাও, নফল পড়, যথারীতি নামায পড়। তোমরা যারা ছাত্র, ছোট বয়সের, তাদের জন্য রমযানে অবশ্যই ভোরে উঠে সেহরী খাওয়া, পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে যুক্ত থাকা এবং দুই-চার রাকাত নফল পড়া, নামাযা পড়া, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা-এগুলিই রমযান।

প্রশ্ন: এক ভদ্রলোক হুযুর আনোয়ারকে প্রশ্ন করেন যে, ইসলামে কিসের ভিত্তিতে বিভিন্ন পশুর মাংসকে হালাল কিম্বা হারাম হিসেবে নির্ধারণ করা হয়? হুযুর আনোয়ার (আ.) ২০১৬ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে লিখিত উত্তরে বলেন-

উত্তর: কোন জিনিষের হালাল বা হারাম হওয়ার বিষয়ে ইসলাম ধর্মের নীতি হল, প্রত্যেক সেই বিষয়, যাকে শরিয়ত বিধান নিষিদ্ধ করে নি, তা হালাল বা বৈধ। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'বস্তুত, সমস্ত জিনিসের মধ্যে বৈধতা আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত শরিয়তের অকাট্য নির্দেশের মাধ্যমে প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ কোন বস্তুর হারাম হওয়া গ্রাহ্য হবে না।'

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৪)

কুরআন করীম মৃত পশু, বয়ে যাওয়া রক্ত, শুকরের মাংস এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে জবেহকৃত পশুর মাংস হারাম বা অবৈধ আখ্যায়িত করেছে।

(সূরা আনআম, আয়াত: ১৪৬)

কুরআন করীমের বর্ণিত চারটি বস্তুকে হারাম বা অবৈধ হিসেবে অভিহিত করা হয়। অপরদিকে আঁ হযরত (সা.) কিছু কিছু জিনিস খেতে নিষেধ করেছেন, সেগুলিকে নিষিদ্ধ বলা হয়। যেমন-শিকারী পশুর মাংস নিষিদ্ধ। এর মধ্যে হিংস্র জন্তু, শিকারী পাখি সব এর মধ্যে পড়ে। এই সব জিনিসের নিষিদ্ধ হওয়া হাদীসের ভিত্তিতে। হযরত আব্বাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে-

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

অর্থাৎ-রসুলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেক নখ বিশিষ্ট পশু, নখ বিশিষ্ট পাখির মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি বলেন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) খয়বারের যুদ্ধের সময় পোষ্য গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছেন।

অবৈধ ও নিষিদ্ধ, এই দুটি বিষয়কে স্পষ্টকরতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

‘একথা স্মরণ রাখা উচিত যে ইসলামী শরিয়তে যে জিনিস গুলি খেতে নিষেধকরা হয়েছে তা দুই প্রকারের। এক- হারাম বা অবৈধ, অপরটি হল নিষিদ্ধ। আভিধানিক অর্থে হারাম শব্দটি উপরোক্ত দুটি প্রকারের উপরই ভারি। কিন্তু কুরআন করীম এই আয়াতে (অর্থাৎ বাকারা: ১৭৪) কেবল চারটি জিনিসকে হারাম আখ্যা দিয়েছে। অর্থাৎ-মৃত, রক্ত, শুকরের মাংস এবং সেই সব পশুর মাংস যা জবেক করার সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে জবেহ করা হয়েছে। এগুলি ছাড়াও ইসলামী শরিয়ত আরও কতিপয় জিনিষের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু সেগুলি নিষিদ্ধ বস্তুর তালিকায় এলেও কুরআনী পরিভাষা অনুসারে হারাম বা অবৈধ হবে না।

আদেশটি এই আয়াত বা অন্য কোন আয়াতের তত্ত্বের পরিপন্থী নয়। কেননা যেভাবে বিভিন্ন প্রকারের বিষয় রয়েছে- কিছু ফরয, কিছু ওয়াজিব এবং কিছু সুন্নত। অনুরূপভাবে যেগুলি থেকে বিরত থাকার আদেশ আছে, সেই সব বিষয়ও কয়েক প্রকারের, একটি হল নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকার আদেশ, একটি হল অবৈধ বিষয় থেকে বিরত থাকার আদেশ এবং একটি হল অপবিত্র বস্তু থেকে বিরত থাকার আদেশ। অতএব, হারাম বা অবৈধ হল চারটি বস্তু, বাকি অন্যগুলি নিষিদ্ধ। আর সংখ্যায় এদের থেকেও বেশি যেগুলি থেকে দুরে থাকার বা পবিত্র থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ – মানুষের জন্য সেগুলি থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। অবৈধ (হারাম) এবং নিষিদ্ধ বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক, ফরয ও ওয়াজিব-এর মধ্যেই তাই। কাজেই যে সব বস্তুকে কুরআন করীম হারাম বলে অভিহিত করেছে, সেগুলির অবৈধতা বেশি কঠোর। আর যেগুলি করতে আঁ হযরত (সা.) নিষেধ করেছেন সেগুলির অবৈধতা তুলনামূলক কম। আর যেমনটি আমি বলেছি, আদেশের মধ্যে সেগুলির উপমা ফরয ও ওয়াজিব এবং সুন্নতের ন্যায়। হারাম (অবৈধ) মর্যাদায় ফরযের তুল্য, নিষিদ্ধ ওয়াজিব তুল্য। যেভাবে ফরয এবং ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য করা হয় সেগুলির শাস্তির দৃষ্টিকোণ থেকে, অনুরূপভাবে যে সব বস্তুকে কুরআন করীমে হারাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, মানুষ যদি সেগুলি ব্যবহার করে, তবে তার শাস্তি বেশি কঠোর হবে। আর যেগুলির বিষয়ে আঁ হযরত (সা.) নিষেধ করেছেন, সেগুলি ব্যবহার করলে তার থেকে কম শাস্তি হবে। তবে উভয় অপরাধই শাস্তিযোগ্য আর আল্লাহ্ তা’লার অসন্তুষ্টির কারণ হবে। হারাম বা অবৈধ কাজ করলে মানুষের ঈমানের উপর প্রভাব পড়ে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল পাপ। কিন্তু অন্যান্য বিষয় ব্যবহারে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম পাপ এবং ঈমানহানি হিসেবে প্রকাশ পায় না। উদাহরণ হিসেবে দেখুন- মুসলমানদের কিছু ফির্কা আছে, যারা এই বস্তুগুলিকে বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে বৈধ মনে করে খেয়ে নেয়। যেমন মালিকি ফির্কা, এর প্রভাব তাদের ঈমানের উপর পড়ে না, তাদের মধ্যে ঈমানহীনতা এবং পাপের জন্ম নেয় না, অতীতে তাদের মধ্যে আওয়লিয়ারও জন্ম হতে থেকেছে। কিন্তু শুকর কিম্বা মৃত পশুর মাংস ভক্ষনকারী কোন ব্যক্তিকে ওলীউল্লাহ্ হিসেবে দেখতে পাবেন না। কাজেই হুরমত বা অবৈধ হওয়ারও শ্রেণীবিভাগ আছে, এই চারটি হারাম বস্তু ছাড়া সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকেও সাধারণ পরিভাষায় হারাম বলা হয়। এমনতি কুরআনের পরিভাষা অনুসারে সেগুলি হারাম নয়।”

(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) হালাল ও হারামের দর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

“কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে-

لَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا
حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ
اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ

এটি হালাল কিম্বা সেটি হারাম, এমন দাবি করা খোদার নামে মিথ্যা রচনা করার নামান্তর। খোদা তা’লা ব লে ছে ন -

حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ
وَمَا أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ

হাদীস শরীফে রসুল করীম (সা.) বলেছেন, ‘শিকারী পশুরা হারাম। হিংস্র পশু, শিকারী পাখি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এখন এর বাইরে কাউকে হালাল বা হারাম বলার অধিকার কারো নেই। কিন্তু পৃথিবীতে যেহেতু হাজার হাজার জীবজন্তু আছে, তাই কোনটি খাবে আর কোনটি খাবে না, তা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যা খুব সহজ সমাধান আল্লাহ্ তা’লা বলে দিয়েছেন-

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا
وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

অর্থাৎ হালাল পবিত্র খাও। এর অর্থ এখানে বলে দেওয়া হয়েছে, যে বস্তু পবিত্র, সেটি খাও। অতএব, প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে সব বস্তু উৎকৃষ্ট এবং পবিত্র, যা ভদ্র ও সভ্য লোকেরা গ্রহণকরে, সেই সব খাদ্য খাও। এর মধ্যে পূর্বে বর্ণিত ব্যতিক্রমগুলি দৃষ্টিতে রাখা অত্যন্ত জরুরী। তোতা পাখি খেতে কোন অসুবিধা নেই বলে মনে হয়। কিন্তু আমি খাই না, কারণ আমাদের দেশে সভ্য সমাজের লোকেরা তা খায় না। একবার এক ভদ্রলোক আমার সামনে গোসাপ রান্না করে নিয়ে এসে বলল, গ্রহণ করুন। আমি তাকে বললাম, আপনি সানন্দে আমার দস্তরখানায় বসে খান, কিন্তু আমি খাব না। কেননা, ভদ্র লোকেরা এটা খায় না।

(বদর পত্রিকা, ১৯ নম্বর, ১০ম খণ্ড, পৃ:১, ৯ই মার্চ, ১৯১১)

প্রশ্ন: ইসলামে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সাম্যের বিষয়ে নিজের কয়েকটি সংশয়ের উল্লেখ করে এক ভদ্রমহিলা ইসলামের বিভিন্ন বিধিনিষেধের বিষয়ে হুযূরের নিকট দিক-নির্দেশনা যাচনা করেন। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৬ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখের চিঠিতে এই বিষয়ে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা দেওয়া হল।

উত্তর: আপনার চিঠিতে আপনি নিজের যে সংশয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, তা ইসলামের শিক্ষা এবং মানব প্রকৃতিকে না বোঝার কারণেই তৈরী হয়েছে। ইসলাম কোথাও এমন দাবি করে নি যে পুরুষ ও নারী সব ব্যাপারেই সমতুল্য। কেবল ইসলামই নয়, মানব প্রকৃতিও পুরুষ ও মহিলার সব দিক থেকে সমান হওয়ার দাবিকে নস্যাৎ করে।

তবে ইসলাম অবশ্যই এই শিক্ষা প্রদান করেছে যে, পুণ্যকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যেভাবে আল্লাহ্ তা’লা পুরুষদেরকে পুরস্কৃত করেন, নিজ কৃপাসমুহের উত্তরাধিকারী করেন, ঠিক সেইভাবেই তিনি নারী জাতিকেও পুরুস্কৃত করেন, স্বীয় কৃপারাজির উত্তরাধিকারী করেন। যেমনটি তিনি বলেন-

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّيْ لَا أُضِيْعُ عَمَلَ
عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ
بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَأُكَفِّرَنَّ
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ
الثَّوَابِ (سورة آل عمران:196)

(আলে ইমরান: ১৯৬)

অনুবাদ:যতদূর পুরুষ ও নারীর সাক্ষীর সম্পর্ক, মহিলাদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক নেই, সেখানে যদি সাক্ষীর জন্য নির্ধারিত পুরুষকে না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে একজন পুরুষের সঙ্গে দুইজন মহিলাকে রাখা হয়েছে, এই জন্য যে, কেননা এই সব বিষয়ে মহিলাদের সরাসরি সম্পর্ক থাকে না, কাজেই সাক্ষী দানকারী মহিলা যদি নিজের সাক্ষী ভুলে যায়,তবে দ্বিতীয় মহিলটি তাকে স্মরণ করাবে। যদিও এতেও সাক্ষী একজন মহিলা। এমন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকার কারণে তার ভুলে যাওয়ার আশঙ্কাকে দৃষ্টিতে রেখে সতর্কতা হিসেবে দ্বিতীয় মহিলাকে তার সাহায্যের জন্য এবং তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য রাখা হয়েছে। কুরআন করীমের যুক্তিও এই অর্থকে সমর্থন করছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى
اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ......وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ
اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى

(আল বাকারা: ২৮৩)

এবং যতদূর মহিলাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সরাসরি সম্পর্ক, তা হাদীস থেকে প্রমাণ হয়। হুযুর (সা.) এক মহিলার সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে এক বিবাহিত দম্পতির বিচ্ছেদ করিয়ে দেন, এজন্য যে সেই মহিলা সাক্ষী দিয়েছিল, ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই সে দুধ পান করিয়েছিল। হযরত উকবা বিন হারিস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আবু আহাব বিন আযীযের কন্যার সঙ্গে নিকাহ করেন। এরপর এক মহিলা এসে দাবি করে, সে উকবা এবং সেই মেয়েটিকে দুধ পান করিয়েছি যাকে উকবা নিকাহ করেছে। (অতএব এরা পরস্পর দুধ ভাই=বোন, এদের মধ্যে নিকাহ বৈধ নয়)। উকবা বললেন, আমি জানি না যে তুমি আমাকে দুধ খাইয়েছিলে কি না, আর তুমি এর আগে এ সম্পর্কে আমাকে কখনও অবগতও করনি। অতঃপর উকবা বাহনে চড়ে রসুলুল্লাহ (সা.)এর কাছে মদিনায় পৌছন। তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে নবী (সা.) বললেন, এখন যেহেতু এই কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তুমি কিভাবে তাকে তোমার নিকাহ বন্ধনে রাখতে পার? উকবা সেই মেয়েটিকে ছেড়ে দেয় এবং অন্য একটি মেয়েকে নিকাহ করে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ইলম)

যতদূর তালাক ও খোলার সম্পর্ক, এক্ষেত্রেও কোন তারতম্য নেই। বরং পুরুষকে তালাক দেওয়ার অধিকার দেওয়ার পাশাপাশি মহিলাকেও খোলা নেওয়ার অধিকার প্রদান করা ইসলামের এটি অনুগ্রহ। এক্ষেত্রেও পুরুষ ও মহিলাকে সমান সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। পুরুষ যখন তালাক দেয়, তখন তাকে স্ত্রীকে আর্থিক বিষয়ের যাবতীয় অধিকার দিতে হয়, উপরন্তু স্ত্রী ইতিপূর্বে যা কিছু আর্থিক সুযোগ সুবিধা লাভ করেছে, তা থেকেও কিছু ফেরত নিতে পারবে না। অনুরূপভাবে স্ত্রী যখন স্বেচ্ছায় স্বামীর কোন অপরাধ ছাড়াই খোলা নেয়, তখন তাকেও পুরুষদের কিছু আর্থিক অধিকার, যেমন হক মোহর ইত্যাদি ফিরিয়ে দিতে হয়। কিন্তু যদি স্ত্রীর খোলা নেওয়ার ব্যাপারে স্বামীর কোন অন্যায় প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে দ্বিগুণ লাভ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে তাকে হক মোহরও তার প্রাপ্য, যার মীমাংসা অবশ্যই বিচার বিভাগ সব কিছু দেখে করে থাকে।

আহলে কিতাবের সঙ্গে বিয়ে করা, অভিভাবকের প্রয়োজনীয়তা

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 12 Aug, 2021 Issue No.32

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

এবং পুরুষদের একাধিক বিবাহ করার অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে বস্তুত মহিলার নিরাপত্তা, সম্ভ্রম ও সম্মানকে দৃষ্টিতে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা পুরুষদের তুলনায় নারীকে সাধারণত দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন, তাদের স্বভাবে প্রভাব গ্রহণ করার বৈশিষ্ট নিহিত রেখেছেন। কাজেই একজন মুসলমান মহিলার একজন আহলে কিতাব পুরুষকে বিবাহ করা থেকে বিরত রেখে তার ধর্মকে রক্ষা করা হয়েছে।

বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়ের সম্মতির পাশাপাশি তার অভিভাবকের সম্মতির শর্ত রাখার অন্যান্য বহু উপযোগিতার মাঝে একটি হল মহিলাকে সাহায্যকারী এবং রক্ষক হিসেবেও একজনকে দেওয়া। যাতে মেয়ের বিয়ে পর তার শ্বশুর বাড়ির লোক এ বিষয়ে সচেতন থাকে যে, মেয়ে একা নয়, তার খবর নেওয়ার মানুষও আছে।

মেয়েদেরকে এক সময়ে একটি বিবাহের অনুমতি দিয়ে ইসলাম তার সম্মান রক্ষা করেছে। আর মানুষের আত্মাভিমান অনুযায়ীই এই আদেশ দেওয়া হয়েছে।

যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে মেয়েরা বেশি জাহান্নামে যাবে, সেখানে মানুষ এই হাদীসটি অনুবাদ বুঝতে ভুল করেছে। এই হাদীসের মোটেই এই অর্থ নয় জাহান্নামে মেয়েদের বেশি সংখ্যা থাকবে। হুযুর (সা.) বলেছেন,

أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءِ يَكْفُرْنَ۔

অর্থাৎ–আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে, যেখানে আমি দেখেছি, এমন মেয়েদের সংখ্যা বেশি যারা নিজেদের স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ যে সব মেয়েরা নিজেদের কর্মদোষে জাহান্নামে ছিল, তাদের অধিকাংশই এমন মেয়ে যারা নিজেদের স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ।

কাজেই, প্রথমত এই হাদীসের মোটেই এই অর্থ নয় যে জাহান্নাামে পুরুষদের থেকে মহিলারা বেশি সংখ্যায় থাকবে। দ্বিতীয়ত এখানে স্েই সব মেয়েদের জাহান্নামে যাওয়ার কারণও বলে দেওয়া হয়েছে, তারা এমন মেয়ে হবে যারা কথায় কথায় খোদা তা'লার সেই সব অনুগ্রহকে অস্বীকার করে, যা তাদের স্বামীদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর করেছেন।

এছাড়া এর বিপরীতে হাদীসে পুণ্যবতী ও পূতঃপবিত্র মহিলাদের পায়ের তলায় জান্নাত থাকারও সুসংবাদ শোনানো হয়েছে, যা কোন পুরুষের সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় নি।

এছাড়া ইসলাম পুরুষ ও মহিলাদের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের কিছু কিছু অধিকার ও কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করেছে। কায়িক পরিশ্রম করার এবং সংসারের যাবতীয় চাহিদাবলী পূরণের দায়িত্ব পুরুষদেরকে দেওয়া হয়েছে আর মহিলাদেরকে ঘর-সংসার এবং সন্তানের দেখাশোনা ও লালন পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বাইরের দৌঁড় ঝাঁপ করার জন্য পুরুষকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী নির্বাচিত করা হয়েছে আর মেয়েদের প্রকৃতি ও সম্ভ্রমকে দৃষ্টিতে রেখে সংসারের নেতৃত্ব তার হাতে দেওয়া হয়েছে।

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, 'ধর্ম এবং বুদ্ধির দিক থেকে মেয়েদের মধ্যে এক প্রকারের ঘাটতি আছে। এতে কোন সন্দেহ নেই, কেননা এটিও মেয়েদের প্রকৃতি অনুযায়ীই বলা হয়েছে। ধর্মের বিষয়ে ঘাটতি আঁ হযরত (সা.) নিজেই বলেছেন, মেয়েদের জীবনের বড় অংশে প্রতি মাসে তাদের জন্য এমন কয়েকটি দিন আসে যখন তারা যাবতীয় ইবাদত থেকে অব্যহতি পায়। আর দেখতে গেলে মেয়েদের উপর এটিও এক প্রকারের খোদা তা'লার কৃপা। অপরদিকে বুদ্ধির ঘাটতির বিষয়েও মেয়েদেরকে ছোট করা হয় নি, এর দ্বারা মেয়েদের সরলতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তারা যে সরল প্রকৃতির তার প্রমাণ বর্তমান যুগের মেয়েরা নিজেরাই দিয়ে চলেছে। কেননা পশ্চিমা দেশের পুরুষেরা তাদেরকে স্বাধীনতার প্রলোভন দেখিয়ে যেভাবে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, তা সত্যবাদীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট সত্যবাদী হযরত মহম্মদ (সা.)-এর এই কথার সত্যতার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

পুরুষেরা নিজেদের কাম লালসা চরিতার্থ করতে তাদেরকে বাড়ির ঘেরাটোপ থেকে বের করে বাজারে এনে ফেলেছে। আর ইসলাম জীবন জীবিকার যে দায়িত্ব পুরুষদের উপর ন্যস্ত করেছিল, সেখানেও পুরুষরা মেয়েদের সরলতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের দায়িত্ব তাদেরকে ভাগ করে দিয়ে তা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, যেখানে তাদেরকে পুরুষদের মত পরিশ্রম করার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পুরুষদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হয় যারা অনেক সময় নিজেদের দৃষ্টি লালসা পুরো করতে বিভিন্ন ভাবে তাদের উপর নজর দেওয়ার চেষ্টা করে।

আর যদি গভীরে গিয়ে চিন্তা করা হয়, তবে দেখা যাবে যে পশ্চিমি দুনিয়ার মহিলা ও পুরুষদের সাম্যের ঘোষণা কেবলই একটি ফাঁপা বুলি। এই পশ্চিমি দুনিয়াতে একটিও এমন দেশে নেই যার প্রশাসন তন্ত্র পরিচালনাকারী সংসদীয় ব্যবস্থাপনায় পুরুষদের সমতুল্য মেয়েরা রয়েছে। এই পশ্চিমি দেশগুলিতেই বহু জায়গায় একটি চাকরীর জন্য একজন পুরুষকে যে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, সাধারণত সেই একই চাকরীর ক্ষেত্রে একজন মহিলাকে সেই সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় না। এর এই সবই মেয়েদের সরল হওয়ার জীবন্ত সাক্ষী।

যতদূর কুরআন করীমের পুরুষকে 'কাওয়াম' হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রসঙ্গটি রয়েছে, সেখানে কুরআন করীম স্বয়ং এর কারণসমূহও বর্ণনা করেছে। একটি কারণ হল, পরিবার পরিচালনার জন্য এক পক্ষকে অপর পক্ষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে আর দ্বিতীয় কারণ হল, পুরুষ তার সম্পদ স্ত্রীর উপর খরচ করে।

এক পক্ষের উপর অপর পক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কারণ মানব প্রকৃতির দাবি সঙ্গত, কেননা, আমরা যদি জাগতিক ব্যবস্থাপনার দিকে দৃষ্টি দিই, তবে দেখব সর্বত্রই এক পক্ষ উপরে থাকে আর অপর পক্ষ তুলনায় কিছুটা নীচে অবস্থান করে। পৃথিবীতে যদি সকলে সমান হত, বা যদি বলি সকলেই বাদশাহ হয়ে যেত, তবে পৃথিবী একদিন চলতে পারত না। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা কিছু মানুষকে বড় আর কিছু মানুষকে ছোট, কিছু মানুষকে ধনী আর কিছু মানুষকে দরিদ্র করেছেন। আমরা দেখি যে প্রত্যেক দেশে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি তন্ত্র থাকে। সেই দেশের সকলেই যদি তন্ত্রের অংশ হয়ে যায় তবে দেশ চলবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা পারিবারিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পুরুষকে তুলনামুলকভাবে বেশি ক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু যেভাবে দেশের নেতা এবং দেশের তন্ত্রের অতিরিক্ত ক্ষমতার পাশাপাশি সেই অনুপাতে অতিরিক্ত কর্তব্য ও দায়িত্বও এসে পড়ে। অনুরূপভাবে ইসলাম পুরুষের উপর মহিলাদের তুলনায় অতিরিক্ত দায়িত্বও ন্যস্ত করেছেন।

কাজেই পুরুষ ও মহিলার অধিকার কর্তব্যের নিরিখে ইসলামী ব্যবস্থাপনা প্রকৃতির বিধান অনুসারেই নির্ধারিত হয়েছে, এতে কোনও প্রকার ঘাটতি নেই।

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর মজলিসে ইরফানে বর্ণিত একটি নির্দেশের আলোকে চাচা ও মামার সামনে পর্দা করার বিষয়ে হুযুর আনোয়ারের কাছে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার আবেদন করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ১লা জুন তারিখে লেখা চিঠিতে উত্তরে বলেন–

উত্তর: আপনি চিঠিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)–এর যে নির্দেশের উল্লেখ করেছেন তা সূরা নূরের ৩২ নং আয়াতের আলোকে মজলিসে ইরফানে একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রদান করা হয়েছিল।

একথা সঠিক যে এই আয়াতে বর্ণিত যে যে আত্মীয়ের সামনে মেয়েদেরকে পর্দা না করার অব্যহতি দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে চাচা ও মামার উল্লেখ নেই। কিন্তু এরা উভয়ে 'মাহরাম' (যাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ নয়) -এরই অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি হুযুরও তাঁর মন্তব্যে একথা বলেছেন। আর সূরা নূরে বর্ণিত কুরআনী নির্দেশ থেকেও এটা প্রমাণ হয়। কেননা এদের উভয়ের সঙ্গে নিকাহ করার হুরমত (অবৈধতা) বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়াও হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.)এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর এক প্রশ্নের উত্তরে হুযুর (সা.) তাঁকে চাচার সামনে পর্দা না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সাথে পর্দার বিষয়ে একথাও দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে মাহারম আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক শ্রেণীর আত্মীয়দের সামনে পর্দার বিষয়ে অব্যহতির পৃথক পৃথক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সূরা নূরে যে সব মাহারম আত্মীয়ের সামনে পর্দা না করার অব্যহতি দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যেও প্রত্যেক আত্মীয়ের থেকে অপর এক আত্মীয়ের সামনে পর্দার অব্যহতির বিষয়ে পৃথক পৃথক রূপ হবে। যেমন স্বামীর সামনে পর্দার যে অব্যহতি রয়েছে, তা সেই আয়াতেই বর্ণিত পিতা, পুত্র ও ভাইদের সামনে পর্দার অব্যহতি থেকে আলাদা। কাজেই যেভাবে এই আয়াতে বর্ণিত আত্মীয়দের সামনে পর্দার বিভিন্ন রূপ রয়েছে, অনুরূপভাবে অন্যান্য মাহারম আত্মীয়ের সামানেও পর্দার অব্যহতির ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে।

(ক্রমশ......)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir